শারদীয়া বাংলা ছোটগল্প
২০৮০

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

দুই বাংলার
একমাত্র ছোটগল্পের ত্রৈমাসিক

শারদীয়া

বাংলা ছোটগল্প

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮০

মহাশ্বেতা দেবী	বীরভোগ্যা	৭
সামসুল হক	সিঁড়ির সামনে	১৩
দিলীপ সেন	সমুদ্রের স্বাদ	১৭
অমিয় রায়চৌধুরী	খিম্পু ছু'র আয়নায়	২৫
অসিত গুপ্ত	সূর্য সন্ধান	৩৬
শান্তি লাহিড়ী	অশোকের অনুশাসন	৪৪
সত্যেন আচার্য	অসমছন্দ	৪৮
জহর সেনগুপ্ত	কৃষ্ণচূড়ার নিচে	৫৩
তৃপ্তি বসু	টেক্কা	৫৮
বিপুল সেনগুপ্ত	প্রিয় সুনীল ও লেডিস্‌ব্যাগ	৬৫
সুনীল বসু	প্রশ্ন	৭২
স্বদেশরঞ্জন দত্ত	রজনীগন্ধার বয়স	৭৬

প্রচ্ছদ
মোহন দস্তিদার

অলংকরণ
অজিত মল্লিক

সম্পাদক
স্বদেশরঞ্জন দত্ত

বিভিন্ন শারদ সংকলন ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা আহ্বান করছি, এ বিষয়ে উপযুক্ত মতামত ও চিঠিপত্র পরবর্তী বিশেষ বড়দিন সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে লেখা দপ্তরে পৌঁছনো আবশ্যক।

সম্পাদক, বাংলা ছোটগল্প

দাম : এক টাকা

With Best
Compliments from :

M/S PIONEER INDUSTRIAL WORKS (P) LTD.

101/1B Karaya Road Calcutta-17

নিয়মাবলী

উপন্যাস বড়গল্পের প্রলোভন মুক্ত বাংলা ছোটগল্পের কোন পত্রিকা নেই। বাংলা ছোটগল্প একমাত্র ছোটগল্পের পত্রিকা, এখানে নবীন গল্পকারদের অগ্রাধিকার থাকবে।

লেখার কপি রেখে পাঠাবেন, কোন রচনাই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হবে না, মতামতের জন্যে ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।

গল্প আয়তনে ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলোচনার জন্য দু কপি বই পাঠাবেন। বাংলা ছোটগল্প ও গল্পের সংকলন নিয়ে আলোচনা করতে আমরা অধিক আগ্রহী।

শ্রাবণ ১৩৮০ থেকে ত্রৈমাসিক বাংলা ছোটগল্পের বর্ষারম্ভ।

গ্রাহক মূল্য সাধারণ ডাকে বার্ষিক চার টাকা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বিশেষ সংখ্যার অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হবে না।

নমুনা সংখ্যা এবং দশ কপির কম ভি. পি. যোগে পাঠানো সম্ভব নয়।

দুই বাংলা এবং অন্যত্র এজেন্ট চাই, যোগাযোগ করুন।

যাবতীয় যোগাযোগের জন্য

বাংলা ছোটগল্প

১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০

তৃপ্তি বসুর

বেগম বৌ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'গল্পগুলি এক কথায় অপূর্ব। লেখিকার পরিমিতিবোধ অপূর্ব।'

আশাপূর্ণা দেবী—'প্রতিটি গল্পেরই অপূর্ব একটি আবেদন আছে। বেশ পাকা হাতের ছাপ দেখতে পেলাম।'

অমৃত—'লেখিকার রচনায় শক্তিমত্তা আছে এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, জীবনকে নতুন দিক থেকে দেখার চোখ আছে তাঁর, ভাষা দিয়ে তাকে রূপায়িত করার অনায়াস পদ্ধতি তাঁর করায়ত্ত।'

যুগান্তর—'গল্প বলার মিস্টিসুরের ব্যঞ্জনায় প্রতিটি গল্পই রসোত্তীর্ণ। 'বেগম বৌ' বাংলা গল্পসাহিত্যে সত্যিই এক অভিনব সংযোজন।'

দাম: তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী

কলকাতা

পটভূমি কালিয়াং,

অমিয় রায়চৌধুরীর উপন্যাস

পটভূমি কালিয়াং প্রেমের উপন্যাস কিন্তু এর কোথাও গতানুগতিকতার চিহ্ন নেই। কাহিনী, ভাষা, চরিত্র এবং পটভূমি সব মিলে এই উপন্যাস এমন এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে পাঠকের মন থেকে সহজে যার রেশ মুছে যাবার নয়।

ভাবনা এবং প্রকাশভঙ্গীর আশ্চর্য সংযম বলে পটভূমি কালিয়াং বাংলা কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

দাম পাঁচ টাকা

খসড়া C/o সরকার প্রকাশন

বি ৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর, নাথ ব্রাদার্স, শৈব্যা পুস্তকালয়

কলিকাতা-১২

প্রকাশের পথে

অমিয় রায়চৌধুরীর উপন্যাস

অন্য জীবন

Gram : GEARCOUP Phone : 46-7301

KAPSEK TRANSMISSION DRIVE MFG. CO.

131 (Block 8) N. S. C. ROAD
Calcutta-40

Manufacturers : CURVED TOOTHED FLEXIBLE GEAR COUPLINGS, GEBS, PINIONS Etc.

With the Best Compliments of—

R. B. & CO.

PRINTERS, BINDERS AND GOVT. ORDER SUPPLIERS

135, Rash Behari Avenue
Calcutta-29

With best Compliments from :

AJANTA FLOOR PRIVATE LTD.

32. MOHENDRA ROY LANE
CALCUTTA-46

বীরভোগ্যা
মহাশ্বেতা দেবী

গাড়িবারান্দাটার ঠিক নিচেই বসে থাকে ও, আজও বসেছিল। বাসস্টপের গায়েই ওর আস্তানা। চেয়ে চিন্তে, ভিক্ষে করে, ডাস্টবিন বা পথ থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছে ও। চিটধরা কাঁথা, ময়লা লেগে লেগে তেলচিটে মোলায়েম বালিশ, রবারের চটি, হাতলছেঁড়া প্ল্যাস্টিকের বালতি ব্যাগ, টিনের কৌটো, একটা প্যাকিং বাক্স। ওই প্যাকিং বাক্সে ও কৌটোয় কৌটোয় ভিক্ষের চাল, নুন, পচা আলু, গলা পেঁয়াজ, ফুটপাথ থেকে কুড়োন ডাল রাখে। রাখতেই হয় ওকে, কেননা ও অন্নপূর্ণা। ফুটপাথে যাদের ঘর, অথচ যাদের বাপ-মার বালাই নেই, সে রকম সাত আটটা ছেলে ওর ভরসায় বাঁচে।

অন্নপূর্ণার সবচেয়ে পছন্দ ওই বালিশটা। বাসের টাইমকিপার ছেলেটা রোজ নাক কুঁচকে বলে, 'বালিশটাকে তোর সঙ্গে বিদেয় করছি দাঁড়া! গন্ধে একেবারে বমি উঠে আসে।'

অন্নপূর্ণা গলিত দাঁত বের করে শনের নুড়ি কাঁপিয়ে হাসে। বলে, :ক্যাওড়াতলায় যাব যখন বালিশটা মাথায় দে যাব।'

'ক্যাওড়াতলায় তোকে নিচ্ছে কে ?'

'নিতেই হবে। তুই কেন নিবি ? পুলিশ নেবে।'

পুলিশে খুব বিশ্বাস ওর। লেকবাজারের ফুটপাথে ধবধবির বাসিনী মরে গেল, পুলিশের গাড়ি নিয়ে গেল। সেবার লরি যাচ্ছে, চালের লরি, আর একটা ছ্যাঁদা দিয়ে রাস্তা থেকে চাল পড়ছে। চাল পড়ছে, বাস আর গাড়িও আসছে। অন্নপূর্ণার সংসারের বাহাদুর ছেলে মটকা সেই চাল কুড়োচ্ছিল রাস্তা থেকে। বাস আসে, মটকা সরে আসে। বাস চলে যায়, মটকা হাত সাপটে চাল কুড়োয়। শেষে, কি নিয়তি, আরেকটা লরিই ওকে চাপা দিল।

পুলিশের গাড়ি মটকাকেও নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের গাড়ি অন্নপূর্ণাকেও নেবে। তখন এই বালিশটা মাথায় দিয়ে দেবে ছেলেরা। বড় ভাল বালিশটা। সামনের বাড়ির বাবু মরে যেতে বিছানাপত্র সবাই রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। আশ্চর্য নিয়ম ! বাবু মরল হাসপাতালে, বিছানা হল অশুচি। বালিশটা অন্নপূর্ণা কুড়িয়ে এনেছিল। ময়লায়, ঘামে, কি সুন্দর আস্তরণ পড়েছে বালিশে। শুয়ে শুয়ে এক হাতে মাথার উকুন বাছে অন্নপূর্ণা, আরেক হাতের আঙুল বালিশে বোলায়। আর স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে লেকবাজারের দোকানীরা হঠাৎ স্বপ্নে দৈববাণী পেয়ে ওর ছেলেদের হাতে ঝুড়ি পচা কপিপাতা, পচা মুলোশাক, আধপচা আলু, গলিত পেঁয়াজ, বাসি পোনামাছের পেটপচা নাড়িভুড়ি দিয়ে দিচ্ছে। অন্নপূর্ণা যজ্ঞির রান্না করছে।

মশলার দোকানের সামনের ফুটপাথ থেকে লঙ্কার বিচি, হলুদের টুকরো এনে অন্নপূর্ণা ক্যানেস্তারা টিনে রান্না চাপিয়েছে। ছেলেদের হাতে ভাঙা সানকি, টিন। ওদের মুখে হাসি, বিড়ি, নোংরা কথা। আজ ওরা পেটপুরে খাবে তাই লালুটা ডিগবাজি খাচ্ছে।

ঘুমের সময়ে ওকে আরো সুন্দর দেখায়। পলিত কেশ, গলিত দাঁত, লোল চামড়া, ঘোর কালো রং, কোমরে একটা সায়া, গায়ে একটা কানি, যেন জরতী বেশে অন্নপূর্ণা। আশপাশের ছেলেগুলোকে ও ভগবান হয়ে আগলে রেখেছে। তাই ওরা এমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

খুব নিশ্চিন্তে থাকে ওরা। বাসস্টপে যাত্রীদের কাছে পয়সা চায়, সকালে

ভ্যালাউসি! ভ্যালাউসি! বলে আপিসের যাত্রীদের ট্যাক্সি দেখিয়ে দিয়ে পয়সা পায়, বাজার থেকে যা পায় কুড়িয়ে আনে, খায়। সুযোগ পেলেই চুরি করে।

কেউ বা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির নিচের কাচঢাকা তাক থেকে কি রেটে মিষ্টি আর দই বেরোচ্ছে দেখে, আর যারা খেয়ে বেরোয় তাদের কাছে এঁটো ভাঁড় চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খায়।

তারপর একসময়ে ওরা অন্নপূর্ণার সংসারে ফিরে আসে। পাঁঠার মলনাড়ি, পচা আলু, শাকপাতা, নুন দিয়ে ও একটা দুর্গন্ধ ঘ্যাঁট প্রত্যহ রান্না করে। তাই হাতাখানেক খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ে।

ওই মাঝে মাঝে খবর আনে। 'আজ রান্না করবনি, চ, অমুক বাড়িতে ম্যারাপ বেঁধেছে।'

সে দিনগুলো সুখের দিন, উৎসবের দিন। কুকুর আর বেপাড়ার ভিখিরিদের সঙ্গে মারামারি করে ডাস্টবিন থেকে কত কিছু যে পাওয়া যায়। এঁটো পাতা চেটে খেয়ে অন্নপূর্ণা সেদিন আর হাইড্র্যান্ট খুলে ঘোলাজলে হাত ধোয় না। খাবারের গন্ধমাখা এঁটো হাতটা বালিশে বোলাতে থাকে শুয়ে শুয়ে। ফলে বালিশের চটচটে আস্তরণে আরো একটা আস্তরণ পড়ে। ও ভাবে, এই বেশ! আজ ভালমন্দ খেয়েছি, কাল হতে যাখন শোব, তাখন ভালমন্দের গন্ধ পাব।

সবাই যে ডাস্টবিন থেকে খেতে পায়, তা পায়না। উলটো ফুটপাথের দুলো মাদ্রাজী ভিখিরি রামানা বলে, 'আমি কখনো পাই না কেন বল ত?'

অন্নপূর্ণা তখন দুখানা ইটের ওপর কাগজ পেতে ঘুত করে বসে। বলে, 'তুই হাবা বলে পাস না। যামন পাতা ঝপ করে পড়চে, তামন বাতাস হতে পাঞা করে পাতা গুড়িয়ে নিয়ে নিবি। যদি পড়েই গেল, তখন তোরে কুকুরটাকেও দিতে হবে, বেপাড়ার ক্যাঙালদেরকেও। তোর চে' ওদের জোর বেশি গায়ে, তাই নয়?'

অন্নপূর্ণা বিড়ি ধরায়। বলে, 'হাবা কোথাকারে।'

দুলো রামানা বলে 'একদিন একটা বড় ভোজ খেতে হবে।'

অন্নপূর্ণা চিপটেন কেটে বলে 'বড় ভোজ! তুই হাবাটা ম্যারাপ দেখলে ভোজ বুঝিস না, তুই ভোজ খাবি!'

রামানা তখন বলে, 'আজ কিছু দিবি?'

'দোব। অন্নপূর্ণার ঘরে অভাব কি?'

অন্নপূর্ণা হাসে। টিন থেকে সযত্নে রামানাকে এক কৌটো ঘ্যাঁট তুলে দেয়। তারপর বলে 'আজ নে চারদিন হল।'

রামানা বলে 'হাঁ হাঁ, হল!'

'তুই বলেছিলি!'

'এবার আনব। মহারাজা বিড়ি খাওয়াব দেখিস্।'

অন্নপূর্ণা প্রসন্ন হয়ে হাসে। ওর ফোকলা গহ্বরের হাসিতে বাসস্টপ আলো হয়ে যায়। কোঁচকানো কাঁধের চামড়া দেখে মনে হয় যেন গঙ্গার নরম মাটি দিয়ে কেঁচো চলে গিয়েছে তাই এমন কুঞ্চিত দাগ পড়েছে। সেই চামড়া ঢেকে শনের নুড়িগুলো দোলে। অন্নপূর্ণা ঘন ঘন বিড়ি খায়। বিড়ি বা সিগারেট অবধি ওর কাছে চাইলে পাওয়া যায়। বাসস্টপে ঘর বাঁধবার এই এক সুবিধে। ছাবাগুলো আধখাওয়া সিগারেট ফেলে রেখে বাসে উঠে পড়ে। অন্নপূর্ণা যত্নে সেগুলো কুড়িয়ে রাখে।

কেউ ছোঁ মারতে আসে না। সবাই জানে কলকাতার থানা-কে-থানা, অঞ্চল-কে-অঞ্চল, ওয়ার্ড-কে-ওয়ার্ড, বড়রাস্তা, ফুটপাথ, গাড়িবারান্দা, ছোটরাস্তা, পার্ক, সব ভিখিরিরা নিলাম ডেকে কিনে নিয়েছে।

এক এক ভিখিরি, এক একটা জায়গা, আইনসঙ্গতভাবে অধিকার করে রেখেছে। অন্নপূর্ণা এই আটের-বি আর সাতচল্লিশ নম্বর বাসস্টপের গাড়ি বারান্দার স্বত্ব পেয়েছে। উপস্বত্বও যাদের দিয়েছে, তাদের দিয়েছে। এই বাসস্টপে যত পোড়া বিড়ি সিগারেট পড়বে তার স্বত্বও ভোগ করবে। এই কয়েকটা বাড়ি থেকে রাস্তায় যত জঞ্জাল পড়বে, তা থেকে ও কৌটা, রবারের ব্যাণ্ড, সিগারেটের কৌটা কুড়োবে। মাঝে মাঝে এখানে অন্য ফুটপাথের রামানা বা সিতাবিকে দেখা যেতে পারে। সে অন্নপূর্ণার ইচ্ছেতে। ওর অধিকারে কলকাতার যতটুকু আছে, ততটুকুতে ওর বিনানুমতিতে কোন ভিখিরির নাকের পোঁটা ফেলবারও অধিকার নেই।

বহু বছর এখানকার স্বত্ব ভোগ করছে অন্নপূর্ণা, রামানা মাঝে মাঝে বলে, 'তোর পর আমি হেথা আসব।'

অন্নপূর্ণা ঘৃণায় তাচ্ছিল্যে হাসে। বলে 'ভারি মুরোদ তোর!'

কেননা ও বিশ্বাস করে বীরভোগ্যা ফুটপাথ। যে ভিখিরির হিম্মত আছে, সেই অন্নপূর্ণার জায়গা দখল করবে। অন্নপূর্ণা যখন থাকবে না, তখন ওর মত হিম্মতদার লড়কু কোন ভিখিরি 'কলকাতা একদিন কলোলিনী তিলোত্তমা

হবে সেরা কাগজ পেতে ক্যালেন্ডারে যখন লেখার খরচা ছাপ দেওয়াবে সেঁটে এখানে শুয়ে শুয়ে দুনিয়াকে জলি ফলি বলতে বলতে ঘুমোবে। নির্বীর্য, ভিতু, কেঁচোগুলো কিছু পাবে না। তারা পঞ্চাশের মন্বন্তরের পোকাগুলোর মত খাবি খেয়ে ফুটপাথে মরবে। ধীর ও শৌর্যসম্পন্ন কানা, খুলো, ঘেয়ো এবং কুঠেরা কলকাতা নিলামে কিনে নেবে, ভোগ করবে। কলকাতা ভিখিরিদের ছিল, আছে, থাকবে। এ দখল বীর্যবানের দখল।

আজ ওরা কেউ নেই। সবাই গেছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ। এক হবু মন্ত্রী মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। ও বাড়ির সামনের ফুটপাথের ভানু খবর দিয়ে গেল। বলে গেল 'বাহান্ন রকম জিনিস খাওয়াবে। পঁচিশ হাজার টাকার ম্যারাপ আর আলো হচ্ছে। তিন হাজার লোক খাবে। খুব খাবি সবাই। মদ আসছে দু গাড়ি। মদ খেলে বাবুরা খাবার খায় না।'

সবাই গিয়েছে। অন্নপূর্ণা যায়নি। শুনেই ও হেসেছে খলখলিয়ে। বলেছে 'যা! তোদের শিক্ষে হক। বাবুর বউ পেত্যহ স্যাটা মাছ কেনে বাজারে, জন্মে পোনা কেনে না। যা তোরা!'

সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেলে পরে আজ অন্নপূর্ণা নিজে বাজারে বেরোল। নিজে ও সব ঘাঁত ঘোঁত জানে। ছেলেগুলো জানবে বলে নিজে যায় না। বাজারে গিয়ে ওরা শিখে নিক সব। ও কি চিরকাল থাকবে?

বাজার থেকে ও আলু পচা, গলা পেঁয়াজ, পাঁটা ও মুরগির মলনাড়ি, রেশনের দোকান ঝেঁটোন গমের দানা নিল। দোকান থেকে নুন চেয়ে নিল।

সযত্নে সব ও রাস্তায় হাইড্র্যান্টের জলে ধুয়ে নিল। তারপর কোঁটো হাতড়ে এক খুঁচি চাল বের করল। সব যখন চাপিয়ে দিল, তখন চেনা, বুকজুড়োন দুর্গন্ধে চারদিক ভরে গেল।

অনেক রাতে ওরা সবাই ফিরে এল। কেউ পায়নি কিছু। অ্যালুমিনিয়ামের চাকা গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল। গোটা গোটা চপ, ফ্রাই, কাটলেট, মাংস, মাছ, রাজভোগ, সন্দেশ, আরো কত জিনিস ওরা আনল আর গাড়িতে ফেলল। ফুটপাথ আর ডাস্টবিন নোংরা করেনি। পুলিশ দাঁড়িয়ে গাড়ি পাস করাচ্ছিল, ভিখিরিদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুনে অন্নপূর্ণা হাসল। ও জানত এমনটা হবে। এরা জানত না। যাক, শিক্ষা হক। ওরা শিখুক।

সকলকে ঘ্যাঁট কৌটোয় কৌটোয় দিতে দিতে অন্নপূর্ণা জিগ্যেস করল, 'হুলোটা কোথা ? মাস্রাজী হুলোটা ?

সে খেপে গিয়ে পুলিশকে ঢিল ছুঁড়ছিল। ম্যারাপে ঢিল মেরে বাতি ভাঙছিল। তা বাদে প্যাদানি খেয়ে নাক মুখ কেটে পথে বসে মুখ ধুচ্ছে। বাদে আসবে। ওঃ, আজ আবার টুপিটা মাথায় দিয়েছিল, তাতে পালক গোঁজা।

'হুলোটা ?'

অন্নপূর্ণার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গভীর চিন্তা ও ভাবনায় হৃদয় আলোড়িত হচ্ছে। তবে কি ওই হুলোটাকেই ও ফুটপাথের স্বত্বটা দিয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে ও কেড়ে নিতে পারবে ? মনে হচ্ছে ওই একদিন মহান নেত্রীর ছবির নিচে ঘুমোবে ?

ও বড় কৌটোটায় রামানার জন্যে বেশি করে ঘ্যাঁট সরিয়ে রাখল। রামানার শরীরে এখন শক্তি দরকার হবে। ফুটপাথ বীরভোগ্যা। রামানা বীর।

With Best Compliments from :

B. N. AGARWALA

134/1 MAHATMA GANDHI ROAD
CALCUTTA-7

সিঁড়ির সামনে

সামসুল হক

বসন্তগোবিন্দ পোদ্দারের অগ্নিপুত্র শুনে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে বাড়ি ফিরে এসে সিঁড়িতে পা দেবার মুখে বারান্দায় চোখ পড়তে দেখলুম আমার ব্লাণ্ট ছেলেটি সামনের লোনাধুলোওঠা মাঠটার দিকে অপলক চেয়ে আকবরের রক্তমাখামুখটা উপভোগ করছে।

আমাদের সিঁড়িটা প্রায় স্বর্গের সিঁড়ির মতো।

ওপরের লোক নিচের লোককে দেখতে পায় না এবং নিচের লোক ওপরেরটা নয় যদিও উভয়দিকের পায়ের শব্দ শোনা যায়।

দিনের বিভিন্ন সময়ে একই লোকের পায়ের শব্দ বিভিন্ন হয়।

একই লোকের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন রকমের দিন আসে।

একটা ঘণ্টার মধ্যেই জন্ম রবীন্দ্রসঙ্গীত বিপ্লবের বানা এবং আকবরের রক্তমাখা মুখ আসে।

আকবরের মুখ আঁকার জন্যে শিল্পী না হয়েও যে কোনো লোক আঁকতে পারে এমনকি একটা শিশুও শুধু আকবর নিজে ছাড়া।

নিজের মুখ আঁকতে গেলে হয় ঈশ্বর হবে না হয় শয়তান।

আকবর সম্ভবত ঈশ্বর এবং শয়তান দুটোর কোনটাই নয়।

আমার ছেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে দেখছিল সেটা একটা আকবর এবং শুধুই আকবর যার কোনো উপাধি নেই।

সে তার উপাধির মাংসখণ্ডটি হয়তো কোনো শমীবৃক্ষে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিল সেখান থেকে শকুনেরা তাদের প্রকৃতির দান নিয়ে গেছে।

কাজেই আকবর প্রায়ন্যাংটো হয়ে এই রাস্তাটায় ঘুরে বেড়ায় যাকে ঠিক ভ্রমণ করা না বলে পাগলের আহার্য সংগ্রহ বলাই সঙ্গত।

এবং যে আনন্দ এই পৃথিবীর মানুষের কাম্য সামন্তরাজার মতো সেই মানুষেরা আকবরের শরীরে লাঠির খোঁচা দিয়ে দিয়ে তা শোষণ করে নিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ঠোঙা থেকে গরম পেঁয়াজি খায়।

ফলে আকবর খোদাবক্সের হোটেলের সামনে গিয়ে ভাত চাইলে হোটেলের ছোঁড়াগুলো বলে—বল্ নারায়ে আল্লাহ আকবর।

ভাত দেবে তো ?

বল্ না শালা আল্লাহু আকবর।

ভাত দেবে তো ?

দেবো বল্।

নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর।

হোটেলের ছোঁড়াগুলো ফ্যা ফ্যা করে ওঠে আর পিছন থেকে একজন আকবরের পিছনের কানিটা লাঠির ডগায় উঁচু করে ধরে আর সেই সুযোগে অন্নব্রহ্মের এক মগ গরম ফ্যান তার পাছায় একজন ঢেলে দ্যায়।

হাউমাউ করে ওঠে আকবর।

ছোঁড়াগুলো ফ্যা ফ্যা করে হাসতে হাসতে ভেঙে যায়।

ফলে আকবরকে এক ছুটে মনোরঞ্জনের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতেই হয়।

কী বাবা গোপাল ঠাকুর ?

এট্টু চা।

বেশ বেশ একটু কেন এক গেলাস দেবো কিন্তু বলতো হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চা দেবে তো ?

বল্ না শালা হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

চা দেবে তো ?

দেবো বল্।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

নিতাই আর গৌর বিড়ির ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে বলে—মুতে দিলে হবে তো ?

মুত কি খায় গো ?

কিন্তু মনোরঞ্জন আকবরের হাতের তালুতে একটু চা দ্যায় শেষ পর্যন্ত।

চা নেবার পর হাতটা উপুড় করবে না চিৎ করবে বুঝতে না পেরে আকবর সোজা ছুটতে গিয়ে শহীদবেদিটার উপরে হোঁচট খায় আর পরমেশ্বর দাস ভাঙা হাত নেড়ে খেঁকিয়ে ওঠে – হারামজাদা !

মনুমেন্টের তলায় মিটিং করতে গিয়ে পরমেশ্বর হাত ভেঙেছে।

কেন্নোর মতো পাক খেতে খেতে পরমেশ্বর বলছিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

আমার ব্লাণ্ট ছেলেটা জিগ্যেস করে—ইনক্লাব মানে কি ?

মানেটা ঠিক জানা না থাকায় আমাকে বলতে হয়—সব জিনিশের মানে হয় না ওটা শুধু বলতে হয়।

আকবর কখনো ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলেনি তাই পরমেশ্বরের রাগ।

এই পাগলা শোন্।

আকবর হাঁটুর রক্তটা মুছতে মুছতে বলে—একটা পয়সা দেবে?

একটা পয়সা নিয়ে কি করবি?

তাহলে দুটো।

দুটোয় কিচ্ছু হবে না।

খুশী খুশী মুখে আকবর বললো—তাহলে ক' পয়সা?

আচ্ছা বলতো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

আকবর সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

থ্যাংক্স্।

পয়সা।

এখন তো নেই পরে দেবো।

একথা না বললেও চলে বারীন হালদার আটার গুদোমের সামনে দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সবকিছু লক্ষ্য করছে এবং এই সুযোগ ছাড়ার কোনো মানেই হয় না সে বুঝতে পারে।

কাছে যেতেই বারীন হালদার বললো— বিপ্লবের বাচ্চার খবর কি?

আমার বাবার নাম জানি না।

আচ্ছা বলতো—বন্দেমাতরম।

আটা দেবে?

দেবো বল্।

আকবর সম্রাটের চেয়েও আরো অমানুষিক গলায় চেঁচায়—বন্দেমাতরম।

এবার আটা দাও।

ইনক্লাবের বেলায় বিনা পয়সায় আর বন্দেমাতরমের বেলায় আটা?

আকবর ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ বারীন হালদার তাকে ডেকে হাঁ করতে বলে এক মুঠো আটা তার মুখের ভিতর ছেড়ে দিলো।

আকবর সম্ভবত এবার টিউবওয়েলের জল খেয়ে রোদে পেট বের করে শুয়ে থাকবে যাতে রোদে তার পেটের আটা সেদ্ধ হয়ে পায়েস তৈরি হয়।

কিন্তু সে যখন চোখ বুজে পায়েস তৈরিতে ব্যস্ত টুপি মাথায় খোদাবক্সের পা তার পেটের উপর উঠে আসে।

শালা কাফের হয়ে রাম হরে কৃষ্ণ বলিস?

কোনটা বলবো ?

আর কোনটাই বলতে হয় না কারণ মুখ দিয়ে তরল আটা বেরিয়ে আসছে।

এমন সময় আপনারা অনেকেই সেখানে ঝাঁকে বেঁধে ছুটে এলেন এবং খোদাবক্সের দিকে আপন আপন ভাষায় তেড়ে গেলেন।

খোদাবক্স আকবরের ঘাড় ধরে বললো—বল্ শালা কয়লা কোথায় রেখেছিস ?

আপনারা বললেন—কয়লা ?

শালা হোটেলের কয়লা চুরি করে বেচে এসেছে।

মনোরঞ্জন আল্লাহু আকবর শুনেছে তাই সে বললো—মার শালাকে।

ইনক্লাব আর বন্দেমাতরম যারা শুনেছে তারা বললো—মার শালাকে।

এই পর্যন্ত উপভোগ করে আপনাদের সঙ্গে বসন্তগোবিন্দ পোদ্দারের অগ্নিপুত্র শুনতে গিয়েছিলুম।

কী অসাধারণ ক্ষমতা ভদ্রলোকের—একটানা আড়াই ঘণ্টা না থেমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের কাহিনী একাই বলে গেলেন বা অভিনয় করে গেলেন !

আমার ব্লাণ্ট ছেলেটা রবীন্দ্রজয়ন্তীতে অভিনয় করবে বলে পাড়ার ছেলেদের ডেকে চাঁদা তুলে পয়সাগুলো যে কৌটায় তুলে রেখেছিল সেটা হারামজাদা চাকরটা চুরি করে পালিয়েছে সঙ্গে আমার ঘড়িটাও।

ফলে আমাকে অসময়ে শুতে হচ্ছে এবং অসময়ে মাধবীর জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে এবং মাধবী সময়ে এসে পড়লেও আমি অপ্রস্তুত থাকছি কারণ নিজেকে গোপন করার জন্যে প্রস্তুতি দরকার।

ফলে আমার সব প্রস্তুতি এলোমেলো হয়ে যায়।

আমি উপরে থাকলে আমার প্রস্তুতি থাকে সিঁড়ির নিচে এবং উল্টোটা।

ফলে স্বর্গের সিঁড়ি থেকেও আমার আর স্বর্গে ওঠা হয় না।

রেলিঙবিহীন বারান্দায় আমার ছেলেটা ঝুঁকে পড়লেও সাবধান করতে ভুলে যাই এবং রাত্রের ভাঙা ঘুমে একথা মনে উঠলে ভয় পাই।

অবশ্য ভয়ই আমার সারাক্ষণের সঙ্গী—সাপের ভয়—বজ্রের ভয়—মরে যাওয়ার ভয়—বেঁচে থাকার ভয়—মানুষের ভয়—অমানুষের ভয়—

এবং আকবরের রক্তমাখা মুখের ভয়।

এবং আমার এই স্বর্গের সিঁড়ির ভয়।

সমুদ্রের স্বাদ

দিলীপ সেন

আশ্চর্য মানুষের মন। ঘির জলে রঙিন মাছের মত মানুষের মন। একটা মাছের এ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছগুলো খুশীতে কখনো ডিগবাজী খাচ্ছে, কখনো ঠোকরাচ্ছে ক্ষুধার তাড়নায় এখানে সেখানে। পেট ভর্তি থাকলে ওপরে ভেসে উঠে কাটছে বুড়বুড়ি, তাও অল্পক্ষণের জন্য। তারপর আবার ডুব দিয়ে আর দশটা মাছের মধ্যে হচ্ছে উধাও।

মানুষ আশ্চর্য হয়ে ভাবে কিভাবে মানুষের মন বদলায়। পলে পলে আমরা নতুন সাজে সাজি, নব নব আনন্দের রঙিন চেলিতে অবগুণ্ঠিত করি মনকে। মনেরই অপর সত্তা তখন বর হয়ে অনবগুণ্ঠিত করে তোলে মনকে। শিহরিত হই, সেই খুশীকে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু মুঠো বেঁধে জল ধরে রাখার মত আঙুল বেয়ে সেই খুশী ঝরে যায় টুপুস টুপুস করে। আবার রঙিন রাংতায় মুড়তে চেষ্টা করি সৌভাগ্যকে। আর মনে মনে পুলকিত হই আনন্দকে ধরে রাখতে পেরেছি এই ভেবে। ভাবি এটাই চরম এটাই চূড়ান্ত। কিন্তু একদিন ভুল ভাঙে, সেই পুরোনো মোহ যায় কেটে। মোহমুগ্ধ নয়নের অঞ্জন যায় মুছে। তখন সেই নয়ন খোঁজে অন্তরের সমুদ্রের স্বাদ।

মণিময় ভালবেসে বিয়ে করছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই বিবাহ অগ্রিমিষ্ঠ হবে আগামীকাল। বিছানায় শুয়ে মণিময় ভাবছে আগামীকালের অনুষ্ঠানের কথা, উৎসবের কথা।

আনন্দ অনেক রকমের আছে। অনেক স্তর আছে আনন্দের। মাঝ সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে থাকা আনন্দের আবার গাড়ি বারান্দার ওপর থেকে রাস্তার লোক চলাচল দেখাও আনন্দের। বাথটবে দেহ ভিজিয়ে স্নান করাও আনন্দ তবু দীঘিতে অবগাহন স্নান সে আরেক আনন্দ।

মানুষের জীবনে কতরকমভাবে আনন্দ আসে, কখনো উৎসব করে চৌদোলায় চড়ে আতসবাজীর আলোয় আলোকিত হয়ে আবার কখনো আসে নম্রশীল সলাজ বধূর মত। কেউ তাকে বরণ করে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে আবার কেউ বা শুধুমাত্র আসন-পিঁড়ি সাজিয়ে বসে থাকে যার জন্য আয়োজন সে নিজে এসে অধিকার করে আসন।

সব বিবাহের আগেই ভালবাসা থাকে। কারো জানাজানি, ছানাছানি ভালবাসা, কারো ভালবাসা অশ্রুত গুপ্তমন্ত্রের মত। কেউ বা ভালবাসার গলিপথে ঘুরতে ঘুরতেই ক্লান্ত হয়ে পথ হারিয়ে বিবাহের সদর দরজায় আর পৌছতে পারেনা।

মণিময় মল্লিকাকে ভালবেসেছিল এখন বিয়ে করতে চলেছে। মল্লিকার মধ্যে ভালবাসা আছে। কিন্তু মল্লিকা কি আঁধার? এতদিনকার ভালবাসাকে নিজের মনের মধ্যে সে কি জমিয়ে বসে আছে? যার অবলম্বন হবে তারই ওপর সঁপে দেবে আপন সব ঐশ্বর্য্যের সাথে ধাতব পদার্থের মত একতাল ভালবাসা?

সুখ শেষ হয়ে স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে।

সিগারেট টানতে ভুলে গিয়েছিল মণিময়, পুড়তে পুড়তে ওটা একসময় আঙুলটাকে ছুঁয়ে ফেলল আর তখনই অনুভব করল সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে। এ্যাসট্রেতে ফেলে রাখল ওটা, জোর করে নিভিয়ে দিল না। পুড়ে পুড়ে শেষ হোক। টানার সুখ এখন আর পাওয়া যাবেনা তবে গন্ধের আনন্দ পাওয়া যাবে আরো কিছুক্ষণ।

জানালা দিয়ে আসা হাওয়াতে মশারীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাওয়াটা প্রথমে মশারীর ওপর দিকে ধাক্কা লেগে ঢেউ হয়ে নীচের দিকে নেমে এসে মিশে যাচ্ছে। এই ঢেউ দেখার মধ্যেও এক রকমের আনন্দ পাচ্ছে মণিময়! এই ঢেউগুলিই যেন আগামীদিনের আনন্দের প্রতিভূ হয়ে মিশে যাচ্ছে আপন সত্তায়।

মশারীর চাঁদোয়ার এক কোণায় সিল্ক ক্রচেড সুতো দিয়ে লেখা আছে 'এম' অর্থাৎ মণিময়। মণিময় ওই ছোট্ট অক্ষরটুকুর মধ্যে দেখছে মল্লিকাকে। মল্লিকার 'ম' আজ মণিময়ের 'ম'-এ মিশে একাকার হয়ে গেছে!

কিছুদিন আগে মণিময় ওর এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়েছিল। দেখেছিল চেলি পরা চন্দন চর্চিত সুস্মিত একটি মুখ। এর আগে পাকা দেখার আসরে শ্রীমতীকে দেখছিল মণিময়। আটোসাটো রূপ নয়, অগোছালো সুন্দর হয়েছিল

সেদিন। মনে হয়েছিল মেয়েটির মধ্যে কোন কৌতূহল নেই, নেই যাচাই করার স্পৃহা, বরণীয় না বর্জনীয় কোন বিচারের বালাই নেই। যেন সহজ বৃষ্টির জলে নিজেকে সিক্ত করছে। যেন শুকনো পাতার মত নিজের ক্ষীণ সত্তা নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—দমকা হওয়ায় যেখানে নিয়ে ফেলবে সেখানেই থাকবে পড়ে। আপন ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই, অনায়াসে যে আসছে তাকে বরণ করে নিচ্ছে। নদী থেকে হঠাৎ এক আঁজলা জল তুলে নেওয়ার খুশী।

মণিময় কি মল্লিকার কাছে এক আঁজলা জল না পুরো একটা সমুদ্র ?

সেদিন গংগার ঘোটিতে গিয়েছিল ওরা। ওখান থেকে দূর দৃষ্টি মেলে জাহাজ দেখতে বেশ লাগে। একটা বড় জাহাজের আশেপাশে ছোট ছোট অনেকগুলো ডিঙ্গি ইতঃস্তত ছড়ানো, যাত্রী এবং মাল সমস্তই বিবরমুক্ত করে জাহাজ বিশ্রাম নিচ্ছে ব্যস্তবাগীশ গৃহিণীর মধ্যাহ্ন বিশ্রামের মত। মাঝে মাঝে দুএকটা সাদা মানুষ বুক চিতিয়ে জাহাজের রেলিং-এর ওপর এসে দাঁড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে কোলাহল। মাঝিরা টেমি জ্বালিয়ে নিজেদের গুটিয়ে ফেলছে নৌকোর গণ্ডির মধ্যে।

শিরশির হাওয়া বইছিল। বেশ অন্ধকার নেমেছে চারপাশে। দূরের নৌকোর আলোগুলো বিন্দুবৎ মনে হচ্ছিল। কোন কোনটির ছায়া পড়েছে জলে। দুলছে। বায়ু সেবনকারী প্রৌঢ়জনেরা খানিক আগে পর্যন্ত ছড়ি উঁচিয়ে জোর কদমে পদচারণা করছিলেন।

প্রায় নিভে আসা সিগারেটটা থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মল্লিকাকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল মণিময়।

: উহু, তোমাকে কী আমি আমার গায়ে হাত দেবার অধিকার দিয়েছি ? বলল বটে কিন্তু আরো কাছাকাছি সরে এল মল্লিকা। খানিক সময় কথা বলল না কেউ। নিভে আসা সিগারেটটায় আরাম করে একটা টান দিয়ে মণিময় বলল, 'চল'।

এই হচ্ছে ওদের বেড়ানো। দুজনে মুখোমুখি গভীর সুখে সুখী। ভরা কলসীতে কোন শব্দ হয় না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই শব্দই শোনা গিয়েছিল। মল্লিকা বেড়াতে গিয়েছিল মাসীর কাছে জলপাইগুড়িতে। মাসী ছিলেন স্থানীয় একটি স্কুলের ড্রইং দিদিমণি। কিন্তু মহিলার আঁকার হাত ও ইচ্ছা ছিল যতটা ততোধিক

ছিল প্রয়াস মেয়েদের শরীরচর্চায়। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়েছেন। একমাত্র কন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণা মল্লিকার বয়সী। শুরুতে অপর্যাপ্ত আদরে এবং পরে অত্যাধিক শাসনে কৃষ্ণা ন দেবায় ন ধর্মায় গোছের হয়েছিল। বিদ্যে-বুদ্ধিতে একদিকে যেমন শাণিত করতে পারেনি নিজেকে অপরদিকে তেমনি পারেনি নিজেকে রমণীয় করে তুলতে রমনীমোহনদের জন্য। তাই কৃষ্ণা মাসীর কাছে হয়ে উঠেছিল নির্ঘুম যন্ত্রণা।

মল্লিকা যখন জলপাইগুড়ি মণিময় তখন পড়েছিল কোলকাতার মেস-কোঠায়। দুজনের মধ্যে মাইলের দূরত্ব ছিল অনেকখানি। দূরত্ব অনেক সময় নৈকট্য আনে এই বিশ্বাসে এবং চিঠির মাধ্যমে বিধৃত ছিল পরস্পর। কিন্তু হঠাৎ চিঠির সুর বইতে শুরু করল অন্যখাতে। স্রোতস্বিনী ঝর্ণার শুধু স্বচ্ছ ধারাই নয়, নুড়ির ঘর্ষণ চলল সাথে সাথে। চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া যায় না এটা ছিল দুতরফেরই অভিযোগ। পত্র প্রসংগে পাঠিকার অভাব কোনকালেই ছিল না। মল্লিকার মাসী বেশ নিপুণ হাতে চিঠিগুলোকে জবাই করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন নজর এড়িয়ে ফুরুৎ হল একটি, মণিময়কে লেখা মাসীর চিঠি হাতে পড়ল মল্লিকার। চিঠিটা ছিল মল্লিকার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের সুরে ভরা। মল্লিকা বুঝল মাসীর নজর কোনদিকে। মল্লিকা মাসীর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল। মল্লিকা ভাবল চূড়ান্তভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার আগে চলে আসা দরকার। পরদিনই জলপাইগুড়ি ছাড়ল মল্লিকা। ষ্টেশনে এসেছিল কৃষ্ণা। গাড়ি ছাড়ার খানিক আগে মণিময়ের চিঠিগুলো সব মল্লিকার হাতে তুলে দিয়ে বলল : ক্ষমা করিস।

কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মল্লিকার চোখে জল চলে এসে গিয়েছিল। কৃষ্ণাটা মাসীর মত হয়নি।

মল্লিকা ভেবেছিল ব্যাপারটা ওইখানেই শেষ কিন্তু বাড়ীতে এসে বুঝল ব্যাপারটার ওইখানেই শুরু। জলের তলাকার খবর ওপরের হাল টের পায়নি এতদিন। মাসী সেই ওপরের হালেই হাত দিয়ে তরীর মুখটা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন জলপাইগুড়ি বসে। নিশিথবাবু চিঠিটা পড়লেন বারকয়েক তারপর মল্লিকার মায়ের বড় পোট্রেটটার পেছনে খামটা রেখে দিয়ে মেয়েকে ডাকলেন। গলার স্বর শুনে অনুভব করা গেল বেহালার করুণ মূর্চ্ছণা লেগে রয়েছে তাতে। একমাত্র মেয়ে মলি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেয়েকে নিয়েই বেঁচে রয়েছেন নিশিথবাবু। সবরকম স্বাচ্ছন্দ দিয়ে বড় করে তুলেছেন মেয়েকে। মেয়েকে সুখী করবেন,

নিজে সুখী হবেন এই ইচ্ছায়। হঠাৎ জলপাইগুড়ির এই চিঠিটা সেই সব ইচ্ছাকে গিলতে বসেছে যেন।

নিশিথবাবু মেয়েকে চিনতেন তাই কঠিন আহ্বানের সুরটা বিনীত আবেদনের মত করুণ হয়ে দুই ঘরের বাতাসকে ভরে তুলল। মল্লিকা ছিল পাশের ঘরে। কাছে এল। মেয়েকে কাছে টেনে নিলেন তিনি। তারপর জলভারনত মেঘের মত চোখ দুটি নিয়ে মেয়েকে দেখতে দেখতে সমস্ত ব্যাপারটার একটা উত্তর খুঁজে পেলেন।

'ছেলেটিকে আমার সংগে দেখা করতে বলিস'—নিশিথবাবু আর কোন প্রশ্ন করলেন না, আর কোন কৌতূহল নেই তাঁর। মণিময়কে দেখা করার কথা তিনি না বললেও পারতেন। মেয়ের অমন জিজ্ঞাসাভরা চোখ দুটির সামনে একটা কিছু না বললে ভাল দেখায় না, মেয়েটা হয়ত অন্যরকম কোন অর্থ করতে পারে এই ভেবে বলা। মল্লিকার ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে। তিনি জানেন মলি তেমন কিছু করবে না যাতে তার অমত হবে।

সেই রাতেই মল্লিকা একটা অন্তর্দেশীয় পত্রে লিখল: সব জানাজানি হয়ে গেছে। বাবা তোমাকে দেখতে চাইছেন। কালই এস। বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন! সব শেষের পংক্তিটা যেন অভয় দিচ্ছে মণিময়কে।

হারিয়ে যাওয়া কিছুর হঠাৎ প্রাপ্তি যেমন দমকা আনন্দ আনে মণিময় তেমনি আনন্দে কেঁপে উঠল চিঠিটা পড়ে। মল্লিকা বড্ড প্রাঞ্জল ভাষায় চিঠি লেখে 'সব জানাজানি হয়ে গেছে।'

কথা রেখেছে মণিময়। ছিমছাম পরিচ্ছন্নতায় চা আর বিস্কিটের আতিথেয়তার খানিক সময় কাটিয়ে মণিময় সোফাটায় একা চুপচাপ বসে ছিল। ভাবছিল এটা-সেটা। নিশিথবাবু কী জিজ্ঞাসা করবেন? কোন অফিসে চাকুরী কর, পাচ্ছ কত? মণিময় বলবে কিছুই পাইনা কারণ আমি চাকরী করিনা। উত্তরটা একটু রূঢ় হবে, তা হোক। পৃথিবীতে এত কথা থাকতে বেছে বেছে ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করা কেন? তোমার চলে কী করে? না চলার মত মন্দাক্রান্তা তালে। ছাত্র পড়িয়ে কিছু পাই।

মনে মনে মক্স করছিল মণিময়। কিন্তু কোনটাই কাজে লাগল না। নিশিথবাবু এসবের ধার ঘেঁসেও গেলেন না। ভারতীয় লেখক সমাজ ও নোবেল কমিটিকে জড়িয়ে একটা লম্বা চওড়া ভাষণ দিয়ে ফেললেন, মণিময় সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল সে আলোচনায়। আলোচনা চলেছিল বহুক্ষণ।

নোবেল কমিটিকে রেখে আলোচনা বিগত শান্তি সম্মেলন পর্যন্ত এসেছিল। তারপর ঘড়ির কাঁটা ভদ্র সময়টুকু পেরিয়ে যাওয়ার আগেই চলে এসেছিল মণিময় গৃহকর্তাকে খুসি করে এবং কর্তানন্দিনীকে সুখী করে।

মেসে ফিরে দেখে বিছানার ওপর পড়ে আছে একটা চিঠি। জলপাইগুড়ি থেকে কৃষ্ণা লিখেছে। চিঠিটা বার দুয়েক পড়ল মণিময়। বেশ ভাল চিঠি। সহজ সরল সর্তহীন সমর্পণ। ডায়েরীতে আজকের তারিখে লিখল: জলপাইগুড়ি থেকে কৃষ্ণার সুন্দর চিঠিটা পেলাম। পরে আবার কেটে দিল। কী জানি মল্লিকা যদি ডায়েরীটা পড়ে ভুল বুঝতে পারে। যতই নিবেদিত প্রাণ হোক, মল্লিকা তো একটি মেয়ে।

কথামত পরেরদিন দুপুরে কলেজে গিয়ে দেখা করল মণিময় নিশিথবাবুর সংগে। নিশিথবাবু যথেষ্ট সংকোচের সাথে প্রস্তাব রাখলেন। মণিময়ের ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট সমীহ করে নিশিথবাবু বললেন, হঠাৎ জানলাম আলিপুরদুয়ারের একটা কলেজে বাংলার জন্য একজন প্রফেসর প্রয়োজন, তোমার কথা মনে হল। তোমার নেশার সঙ্গে পেশার একীকরণ সম্ভব, যদি গ্রহণ করো। ভাল কোয়ার্টারস্ পাবে, মলিও খুশী হবে। তোমারও ভাল লাগবে আশাকরি।

সম্মতি জানিয়েছিল মণিময়। চাকরী যখন করতেই হবে তখন কলেজে অধ্যাপনাই ভাল। মণিময়ের সম্মতিতে একজন অধ্যাপক হিসেবে নিশিথবাবু খুশী হয়েছিলেন আর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন মল্লিকার পিতা হিসাবে।

এমন সময় বেয়ারা ঢুকল, ফোন এসেছে নিশিথবাবুর। তিনি পাশ্বস্থাতে আওয়াজ তুলে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মণিময়ের মনে হল যেন কোন ঋষি সুখী হবার মন্ত্র জপ করতে করতে খড়মে আওয়াজ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ফোনটা ছিল মণিময়ের, করছে মল্লিকা। কীভাবে যেন খবর পেয়েছে মণিময় নিশিথবাবুর সংগে দেখা করতে এসেছে কলেজে। তলবটা খুব জরুরী। ফোনে নিশিথবাবুকে মল্লিকা শুধু জানাল, বাবা ওঁকে একটু জানিয়ে দাও আমি ওঁর জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ও যেন এখুনি একবার চলে আসে।

নিশিথবাবু যৌবনকালে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেননি তার প্রমাণ দিলেন ফোনে কন্যাকে প্রশ্ন করে: মণিময়কে কোথায় যেতে বলব বললি না তো? 'ও জানে', এই বলে ফোনটা রেখে দিল মল্লিকা।

: মলির ফোন, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, জরুরী দরকার। নিশিথবাবু

বেশ খুশি উপছানো স্বরে কথাগুলো বললেন মণিময়কে। কন্যার প্রণয় উপাখ্যানের কোন একটি অধ্যায়ের অংশত ভূমিকা নিতে পেরেছেন বলে আনন্দিত হলেন মনে মনে। কিন্তু বেশীক্ষণ সেটাকে প্রশ্রয় দিলেন না। নিজের কণ্ঠস্বরকে উপদেশ দেবার মত করে তৈরী করে প্রস্থানোদ্যোত মণিময়কে ফিরিয়ে এনে বললেন, শোন মণিময়, তোমার নতুন চাকরীটার ব্যাপারে আমার যে কিছুটা চেষ্টা আছে তা মলির না জানাই ভাল। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, পরে, স্বামী অনেক অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে পিতার থেকে। তাই আমার এই সামান্য চেষ্টার কথাটা জানাজানি হলে, পরে, কোনদিন হয়তো অসামান্য হয়ে অসম্মানের চেহারা নিতে পারে। তাহলে যেমন তুমি শ্রদ্ধা হারাবে তেমনি আমিও। আর, আমি মানি, স্ত্রীর শ্রদ্ধা হারিয়ে কোন স্বামী সুখী হতে পারেনা।

মণিময় এতক্ষণ ফার্স্ট বেঞ্চার-এর মতন নিশিথবাবুর উপদেশগুলোর গ্রহণ করছিলো ঠিকই কিন্তু মাঝে মাঝে মনের প্রচ্ছদে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সেই নির্দিষ্ট গাছতলাটায় বসে থাকা মলির মুখটা হঠাৎ হঠাৎ চলে আসছিল। হঠাৎ এই জরুরী তলব কেন? গতকালই তো কাছাকাছি ছিলাম। রাতারাতি এমন কী ঘটল যার জন্য আর সবুর না করে একেবারে 'এখুনি এস।' মলিটার বেশ সাহস বেড়েছে, পিতৃদেবকেই ওদের প্রণয়-পর্বের সাক্ষী করছে।

জরুরী তলবটার পেছনের কারণটা ছিল অত্যন্ত কম জরুরী মণিময়ের কাছে। মল্লিকা চেয়েছিল তার এক বিশেষ বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়ে দিতে মণিময়কে। তা যে কোন সময় পরে করিয়ে দেওয়া যেত, তার জন্য এই রকম ভাবে টেলিফোনে ডেকে আনার কোন মানে হয় না। মণিময়ের কাছে এটা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়, ছেলেমানুষী মনে হল।

কিন্তু উপায় ছিল না মল্লিকার। বকুল-এর সংগে দীর্ঘদিন পরে আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল লাইব্রেরীতে। বিয়ের পরে সস্বামী বকুল দীর্ঘদিন হল রাজধানীতে রয়েছে। শ্রীযুক্ত অমরেশ মজুমদারকে নিয়ে বকুলের বেশ গর্ব। রাজধানীতে খুব ভাল চাকরীতে রয়েছেন ভদ্রলোক! ভদ্রলোককে পাওয়ার পর মেয়েটির চেহারাটাই যেন পাল্টে গিয়েছিল। দিল্লী থেকে প্রথম প্রথম বকুল ওকে চিঠি দিত। যে চিঠির অনেকটাই ভরা থাকত বরের কীর্তি গাথায় আর শেষের দিকে থাকত মল্লিকার জন্য কিছু দুঃখ বোধ, কিছু সান্ত্বনা।

তাই লাইব্রেরীতে যখনই বকুলকে দেখল মল্লিকা তখনই ও ঠিক করল বা বলা যায় বকুলের উপস্থিতি ওর মনের দরজায় করাঘাত করে জানান দিলো

দরজাটা খুলতে। স্বামী গর্বে গর্বিত মেয়েটার হাত ধরে অন্দর মহলে নিয়ে যেতে। নিয়ে গিয়ে দেখাত একটি সুন্দর মানুষকে। বুদ্ধিদৃপ্ত, উজ্জ্বল, স্থিতধী, প্রণয়ে পবিত্র, সুন্দর হয়ে ওটা একজন যুবককে।

পরে মল্লিকার কাছে সব শুনে মণিময় অবাক হয়ে মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল আর ভাবছিল মেয়েটা একেবারে প্রেমে অন্ধ।

আজ মণিময়ের মনে পড়ছে অনেক দিনের ছবি। সুখের দিনের ছবি। সুখের দিনের সিঁড়িগুলো পেরিয়ে আসতে আসতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল মণিময়। পিপাসার্ত মনে হল নিজেকে। এখনো অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। হাত বাড়িয়ে পূর্ণ জলের গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল মণিময়।

———

খিল্পু ছু'র আয়নায়

অমিয় রায়চৌধুরী

চিঠিটা হাতে নিয়ে মণিকা সেন অনেকক্ষণ নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। বুকের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্ষীণ স্পন্দন। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে সাহস হচ্ছেনা তার।

ধবধবে সাদা খাম। ধবধবে সাদা জামা পরা লোকটির মতো। যতক্ষণ মনটা দেখা যাচ্ছেনা ততক্ষণ শুভ্র পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি মানুষের প্রতিচ্ছবি। কী লাভ মনটাকে আলাদা করে ছিনিয়ে নিয়ে দেখবার? তার চেয়ে সুন্দর একখানা হাত বুকের মধ্যে নিয়ে এসে শূন্যবুকটাকে উত্তাপে ভরিয়ে তোলা অনেক ভালো। সেই ভেবেই ডাকবাক্সে চিঠি ফেলার মতো খামটাকে ব্লাউজের মধ্যে গলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে মণিকা সেনের মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে যেন হাওয়া বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ওর দম আটকে আসছিল। একটু হাওয়ার জন্য মনটা হাহাকার করছিল। তাই ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে খিল্পু ছু'র পাশে গিয়ে বসল। মণিকা সেনের মন চলে গেল বর্ষণ মুখরিত এক অপরাহ্ণ বেলায়।

লোহার সাঁকোর ওপারে উইলো গাছের ছায়াঘেরা পথে স্কুটারের শব্দ শোনার জন্যে শ্রুতিকে জাগিয়ে রেখেছে মণিকা সেন। খিল্পু ছু'র জলে

উইলো গাছের ছায়া দুলছে। নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মণিকা সেনের মনে আবেগের সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে গর্ভবতী মেঘেরা আকাশ ছেয়ে ফেলল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল খিস্পু ছু'র দু' পাশের শহরতলীতে। পথচারীরা গতি বাড়াল। আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছিল তারা। বৃষ্টি এখানে ভয়ঙ্কর। ভিজলে বুকে অসুখ বাসা বাঁধে। সাবধান বাণী মণিকা সেনকে ও অনেকে শুনিয়েছে। তবু উঠে যাবার কথা তার মনে হলনা। একটু পরেই মুক্তোর দানার মত বৃষ্টি ঝরতে লাগল আকাশ থেকে। মণিকা সেনের ভিজতে ইচ্ছে হল। কতদিন যেন বৃষ্টিতে ভেজেনি। কার্ডিগানটা খুলে রেখে মণিকা সেন ভিজতে লাগল।

সময়ে বৃষ্টির রস পেলে একটি ফল সুডৌল, নিটোল রসালো হয়ে উঠতে পারতো। একটুকরো আলো এক ফোঁটা বৃষ্টির অভাবে ছাব্বিশ বছরের মণিকা সেনের শরীর থেকে যৌবন কেঁদে কেঁদে ফিরে গেছে। ভিজে শাড়ির আবরণ পেরিয়ে মণিকা সেনের অপরিপুষ্ট শরীরটা ভেসে উঠল। মণিকা সেন নিজের শরীরের দিকে তাকালো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝড়ো হাওয়ার কান্নার ঢেউয়ের মতো বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল।

গায়ে সব সময় গরম কাপড় রাখবেন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না, মনে রাখবেন সমুদ্রের পিঠ থেকে আট হাজার ফিট ওপরে আছেন। ভুটিয়া অফিসারের সাবধান বাণী মনে পড়ল। মণিকা সেনের হাসি পেল। গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে হল তার। মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান। জীবনে যার শ্যাম আসেনি ভয় দিয়ে বুক ভরিয়ে রেখে তার কী লাভ? তার চেয়ে নিউমনিয়া বাসা বাঁধুক না বুকে? তবুতো শূন্যতা ছাপিয়ে বুকটা ব্যথায় ভরে উঠবে।

বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে উইলো গাছ। সপ্ সপ্ শব্দের তরঙ্গ জাগছে নদীর জলে। দুর্গের মতো সরকারী ভবন 'তাসি ছোড়ো জং' দেখা যাচ্ছে না আর। জং এর পাশ দিয়ে যে সড়কটা আঁকা বাঁকা সর্পিল ছন্দে ছড়িয়ে ছিল একটু আগে, বৃষ্টির ঘন সাদা পর্দায় তা ঢাকা পড়েছে। ওই পথ দিয়েই সে আসে।

অন্য দিন এমন সময়ে স্কুটারে আওয়াজ তুলে সে আসে। অনেকে দূর থেকে মণিকা সেন তাকে দেখতে পায়। মণিকা সেনের দুটি চোখ তখন

ছুটি খুশির ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। আজ কি তবে সে আসবে না? মণিকা সেনের চোখের আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। বৃষ্টির মত ঝরঝর ধারায় কান্না বুঝি নেমে আসতে চায়।

ঠিক সেই সময় গা ঘেঁষে দাঁড়ায় স্কুটারটা। প্লাস্টিকে মোড়া ছিপছিপে লম্বা মানুষটা স্কুটার থেকে নেমে মণিকা সেনকে হাত ধরে টেনে তোলে।

—কী পাগলামি করছেন? নিউমনিয়া বাঁধিয়ে মরবেন নাকি?

মানব মজুমদারের হাতের স্পর্শ পেয়ে মণিকা সেনের শরীরে শিহরণ খেলে যায়। গাছটা তাহলে এখনো মরেনি। আর একটু আলো আর একটু বৃষ্টি পেলে সবুজ কুঁড়ি থেকে সাদা ফুল ফুটবে। পলাতক যৌবন ফিরে আসবে রাজবেশে।

মণিকা সেন মুখ ফুটে কিছুই বলে না। মানব মজুমদারের তিরস্কার প্রীতির সুর হয়ে তার কানে বাজে। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। যে ফুল এখনো ফোটেনি আগাম তার হাসিটুকু ফুটিয়ে তোলে মুখে। তারপর ধীর পায়ে স্কুটারের ব্যাকসিটে গিয়ে বসে।

মণিকা সেনের কোয়ার্টারে পৌঁছে মানব মজুমদার বলল, তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন।

মণিকা সেন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ছাড়ছি। ভয় নেই অসুখ করবে না আমার। আপনি তো এখানে নতুন এসেছেন এখানকার রোদ-বৃষ্টি-আলো-ঠাণ্ডা ওরা চেনে না আপনাকে তাই হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে। আমার সঙ্গে ওদের দু' বছরের পরিচয়।

মানব মজুমদার শব্দ করে হেসে উঠল তারপর অভিভাবকত্বের সুরে বলল, যান কাপড় ছেড়ে আসুন।

পাশের ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে মণিকা সেন ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলল। শুকনো জামা-কাপড় পরে নিল। একখানা শাল জড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর স্টোভ জেলে দু' কাপ চা তৈরি করে ফিরে এল।

অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মণিকা সেন। মানব মজুমদার বর্ষাতিটা টাঙিয়ে রেখেছে দরজায়। জুতো মোজা খুলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। চোখের সামনে খবরের কাগজ খুলে পড়ছে।

মণিকা সেনের হাত কেঁপে উঠল। চায়ের কাপে চা ছলাৎ ছলাৎ করে দুলে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় মণিকা সেন শুধু একটা কথাই উচ্চারণ করতে পারল চা।

চা খেয়েই উঠে পড়েছিল মানব মজুমদার। জরুরী কাজ আছে। কোথায় বাকি ধ্বদ্ নেমেছে, রোড ব্লক।

মানব মজুমদার চলে যেতেই শুয়ে পড়ল মণিকা সেন। মানব মজুমদারের শরীরের গন্ধ ছড়িয়ে ছিল বিছানায়। গন্ধটা উন্মনা করে তুলল তাকে। নিদ্রাহীন স্বপ্নময় রাত কাটালো মণিকা সেন।

ভারত ভবনের এক অফিসারের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে বর্ডার রোড অর্গানাইজেসানের ইঞ্জিনিয়ার মানব মজুমদার আর ইংরেজি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মণিকা সেন আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানেই আলাপ। সেদিন স্কুটারের ব্যাকসিটে বসিয়ে মানব মজুমদার পৌঁছিয়ে দিয়েছিল মণিকা সেনকে। তারপরের দিন বিকেলে এসেছিল মানব মজুমদার। তারপর প্রতিদিন বিকেলেই এসেছে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা শহরের দূর দূরান্তে। কোনো কোনোদিন শহর থেকে দূরে চিত্রময় কোনো সুন্দর শহরে ওরা বেড়িয়ে এসেছে। সেই সব দিনের তুচ্ছ কোনো ঘটনা কিংবা তুচ্ছ কোনো কথা মণিকা সেনের মনের আকাশে চিরদিনই সন্ধ্যার আকাশের তারার মতো জ্বল জ্বল করবে। কিন্তু সব তারাকে মেঘে ঢেকে দিয়েছিল একদিন। সেই দুর্যোগের রাত্রির স্মৃতি আজ মণিকা সেনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

সেদিন দুপুর থেকেই আবহাওয়া খারাপ ছিল। স্কুল ছুটির পর মণিকা সেন কোয়ার্টারে ফিরে এসেছিল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল, ঝড়-বৃষ্টির মেজাজ ক্রমশঃই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। মণিকা সেনের মনে বিষাদ ঘনীভূত হচ্ছিল, আজ বোধহয় মানব মজুমদার আসতে পারবে না। কত সন্ধ্যাই তো মণিকা সেনের একা একা কেটেছে কিন্তু আজ তার ভাবতে ভয় হচ্ছে মানব মজুমদারহীন সন্ধ্যা সে কাটাবে কী করে? এমন সময় স্কুটারের শব্দ ঝড়-বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে মণিকা সেনের কানে মধুর হয়ে বেজে উঠল। মণিকা সেন ছোট্ট মেয়ের মতো লাফিয়ে উঠে মানব মজুমদারের হাত ধরতে গিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলল, আসুন। আমি ভেবেছিলাম আজ বোধহয় আর এলেন না।

মানব মজুমদার বলল, হ্যাঁ বাধ্য হলাম আসতে।

মানব মজুমদার হেসেই বলেছিল কথাটা। তবু মণিকা সেনের মনে হয়েছিল হাসিটা কেমন যেন ম্লান, গলার স্বরও যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা। নিজেরই মনের ভুল মনে করে মণিকা সেন কোনো গুরুত্ব দিতে চাইল

না ব্যাপারটায়। আগের মতই খুশি খুশি সুরে বলল, চা খাবেন না কফি?

—কোনো প্রেফারেন্স নেই, একটা হলেই চলবে।

মণিকা সেন চমকে উঠল। গলার স্বরে যেন কেমন একটা দুর্যোগের ছাপ। মণিকা সেন কিছুই বলল না। নিঃশব্দে উঠে গেল চা করতে। দু' কাপ চা হাতে নিয়ে ফিরে এসে মণিকা সেন দেখল টেবিলের ওপর দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দু' হাত দিয়ে চোখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসে আছে মানব মজুমদার।

মণিকা সেন উদ্বেগের সুরে বলল, আপনার কি শরীর খারাপ? —না। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা টেনে নিল মানব মজুমদার।

চা খেতে খেতে হঠাৎ আলো নিভে গেল। মানব মজুমদার স্বগতোক্তির মত বলল, কারেন্ট ফেল করল।

হাওয়ায় ঝাউগাছের পাতা যেমন দোলে মণিকা সেনের বুকটা তেমনি দুলে উঠল। অন্ধকার ভালো লাগছে তার। অন্ধকার মনের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, মন তখন মুখর হয়ে উঠতে চায়। এমন অন্ধকারেই তো সেই কথাটা বলা যায়। যে কথাটা বলার জন্যে এবং শোনার জন্যে মনটা কিছুদিন ধরেই তার অধীর হয়ে উঠেছে।

তবু আলো জ্বালা উচিত এই ভেবেই সে দেশলাইটা চাইল। মানব মজুমদার রুক্ষগলায় বলল, কেন আপনার ভয় করছে? ভয় নেই আমি কোনো ক্ষতি করবনা। মানব মজুমদারের কণ্ঠে যেন ব্যঙ্গের সুর। দেশলাইটা বাড়িয়ে দিল মানব মজুমদার।

মণিকা সেন মানব মজুমদারের হাতের স্পর্শ এড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেশলাই না জ্বেলে হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতিটা তুলে নিল হাতে কিন্তু জ্বালল না। বুকের ভেতরটা অসম্ভব জ্বালা করছে তার।

এ কেমন কথা? ভয় নেই আমি কোনো ক্ষতি করব না। মানব মজুমদারের কথাটাই মনে মনে উচ্চারণ করল মণিকা সেন। তারুণ্যোদীপ্ত মানব মজুমদারের কাছ থেকে এমনটি প্রত্যাশা করেনি মণিকা সেন। ক্ষতি ভয় এসব কথা কী মানায় ওর মুখে? এমন আদিম অন্ধকার পরিবেশে ভয় ক্ষতির তো কোনো জায়গাই নেই। এমন নিবিড় মোহময় পরিবেশে

মানব মজুমদার সেই কথাটি বলতে পারতো। যে কথাটি আজও বলা হয়নি। মানুষের সবচেয়ে পুরনো কিন্তু সবচেয়ে নতুন চার অক্ষরের সেই কথাটি। সেই চারটি অক্ষরের মুক্ত উচ্চারণ-ই তো আজ তাদের দূরত্বের বাঁধ ভেঙে দিতে পারে।

জোরে শব্দ করে দেশলাইর কাঠি জ্বাললো মণিকা সেন, মোমবাতির সুতোয় আগুন ছুঁইয়ে দিল। তারপর মোমবাতিটা বাতিদানে বসিয়ে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসল। দু' জনের মাঝখানে দু' হাত চওড়া টেবিলের ব্যবধান। ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিল মণিকা সেন।

মানব মজুমদার তখন সিগারেট টানছে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মানব-মজুমদার বলল, আমি একজনকে ভালবাসি মণিকা, আগামী সপ্তাহে আমাদের বিয়ে। কথাটা যেন খুবই সাধারণ এমন একটা ভঙ্গিতে সহজ ভাবে বলল মানব মজুমদার।

মণিকা সেন মুহূর্তের মধ্যে অহল্যা হয়ে গেল। মনের তন্ত্রীগুলো যেন কোনো অরসিকের নিষ্ঠুর হাতের চাপে ছিঁড়ে গেল। সুদীর্ঘ নীরবতার পর একসময় মণিকা সেন সম্বিৎ ফিরে পেল। ধীরে ধীরে বলল, জানেন মানববাবু এখানে আমার কয়েকজন কলিগ থাকেন সেই কারণেই আলো জ্বালতে চেয়েছিলাম। আপনার ছুটার বাইরে, ঘর অন্ধকার ওরা হয়তো কিছু ভাবতে পারে। ওরা তো জানেনা আপনি কারোর ক্ষতি করেন না।

মানব মজুমদার বিদ্রূপ হজম করে গেল নীরবে।

মণিকা সেন ধীর পায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার শিকের ওপর মাথা রেখে বোবা চোখে তাকিয়ে রইল নদীর দিকে। মানব মজুমদার আবার মুখ খুলেছে। তার কথাগুলো চকচকে তীরের মত মণিকা সেনের কানে বিঁধছিল।

আজ প্রায় একমাস হল মণিকা তোমার সঙ্গে খুব সহজ ভাবে মিশেছি। কেন জানিনা তোমার কাছে আসার জন্যে আমার মনটা ছটফট করতো। যতক্ষণ তোমার কাছে সময় কাটাতাম ততক্ষণ রামধনুর নানারঙে রঙীন এক একটি নিটোল মুহূর্ত আমাকে রাঙিয়ে তুলতো। বাড়ি ফিরে রোজই ভাবতাম, না এ ঠিক হচ্ছেনা। যাকে আমি কিছু দিতে পারবোনা তার কাছ থেকে এমন মুঠো মুঠো আনন্দ নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে ও বলতে পারিনি বা নিজেকে ও সরিয়ে নিতে পারিনি। সান্ত্বনা

দিয়েছি মনকে হয়তো তুমি কিছু না ভেবেই আমার সঙ্গে মেলামেশা করছো। কিন্তু যেদিন পারোতে বেড়াতে গিছলাম সেদিন থেকে আর নিজেকে ফাঁকি দিতে পারিনি। তোমার মনে আছে মণিকা পারোর সেই দিনটির কথা?

মণিকা সেন মনে মনে বলল, সে কী ভোলার দিন?

মানব মজুমদার আবার সুরু করল। পারো মিউজিয়ামের উঁচু বাড়িটার জানলা দিয়ে আমরা নিচের সবুজ উপত্যকা দেখছিলাম। স্নিগ্ধসবুজ শস্যক্ষেত আর তার পাশে চিকচিক করছে সরু নদীটি। আরো দূরে পাহাড়ের নীল আর আকাশের নীলে মেশামেশি হয়ে অনুপম একটা ছবি ছড়িয়ে ছিল আমাদের চোখের সামনে। অমর্ত্য শিল্পীর সেই অনিন্দ্যসুন্দর রচনা আমাদের দু'জনের চোখেই সেদিন অনুরাগের কাজল এঁকে দিয়েছিল। হঠাৎ তুমি ঝরণার মত কলকলিয়ে উঠেছিলে। বলে ছিলে স্যাখো স্যাখো কী সুন্দর! দুটি রঙীন পাখি নদীর পারে খুনসুটি করছিল। তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলে সেই স্বর্গীয় দৃশ্যটার ওপর। কিন্তু হঠাৎ আবেগের বশে আমাকে 'তুমি' ডেকে ফেলায় লজ্জা পেয়েছিলে। টিয়াপাখির ঠোঁটের মত রাঙা হয়ে উঠেছিল তোমার মুখ। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে বলেছিলাম, পাখিদের জীবনটা খুব সহজ, সরল তাই না? তুমি পাখির মতো নরম চোখ তুলে ক্ষণিকের জন্যে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলে। পলকের দৃষ্টিতেই আমি তোমার চোখে ভালবাসার রঙ দেখেছিলাম। আমার যে পিছুটান ছিল তাইতো সাড়া দিতে পারিনি। সেই থেকেই আমার বিবেক আমাকে চাবুক মেরেই চলেছে। ভালবাসার কথা আমি উচ্চারণ করিনি, তোমার শরীর ও ছুঁইনি তবু ভেবে দেখেছি আমার আচরণ ছিল প্রত্যাশা জাগাবার মতই। কাল সকালে ভুটান ছেড়ে চলে যাচ্ছি তাই আজ সংবাদটা প্রকাশ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। ক্ষমা আমি চাইনা তুমি বরং অভিশাপ দিও আমাকে।

মণিকা সেন কোন কথা বলেনি। কিছু বলার মত অবস্থা ছিল না তার। একটা দুঃখের পাহাড়ের মতো অনুভূতিহীন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। যান্ত্রিক নিয়মে গরুরগাড়ির মতো মন্থর গতিতে দিন কাটছিল। বিকেলে থিম্পু ছু'র পারে এসে রোজ বিকেলে বসে। নদীকে দেখে ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সেই ভাবনামুক্ত চঞ্চলতার দিনগুলি। কখনো নদীর জলের সঙ্গে ওর মনটা চলে যায় আট

হাজার ফিট নিচে সমতল বাংলার বুকে। দিনের শেষে নদীর রঙ বদলায়। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকারের রঙ গভীর হয় মণিকা সেন ফিরে আসে কোয়ার্টারে। মাঝরাতে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকার ঘরে মণিকা সেন শুনতে পায় নিজেরই কান্নার সুর। গুমরানো কান্না। কান্নার সুর পাগলা হাওয়ার মতো ঘুরপাক খেতে খেতে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায়। পাহাড় অনড়, কাউ গাছের পাতাগুলো হয়তো নড়ে কিন্তু পাহাড় নির্বাক নিস্পন্দ, অনুভূতিহীন। কান্নার মেঘ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে গলে গলে নদীর জলে মিশে যায়।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়ল ওর গায়ে। মণিকা সেন তাকাল আকাশের দিকে। বৃষ্টি হতে পারে। আকাশের মুখ কালো, থমথমে। উঠে পড়ল মণিকা সেন। আজ আর বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না মণিকা সেন। বুকটা আর শূন্য নেই কবেই তা ব্যথায় ভরে গিয়েছে।

কোয়ার্টারে ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল মণিকা সেন। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে আজ। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে চিঠিটার অস্তিত্ব নতুন করে অনুভব করল মণিকা সেন। কী লিখতে পারে মানব মজুমদার? এতদিন পরে চিঠি লেখার কী কারণ ঘটল? হয়তো অপরাধবোধের জন্যে লিখতে পারেনি এতদিন। চিঠিতে মানব মজুমদারের বিয়ের সংবাদ আছে হয়তো তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করেছে। যদি কোনদিন আমাকে প্রয়োজন হয় জানাতে সংকোচ করোনা। হয়তো আরো লিখেছে এতদিনে আমাকে ক্ষমা করেছ তো? প্রতারকেরা যেমন লিখে থাকে তেমনি একখানি সাধারণ চিঠি।

মণিকা সেন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। লাইট জ্বালল। তারপর বুকের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করে আনল। বুকের ঘামে ভিজে গিয়েছে খামটা। মানব মজুমদারের হাতে লেখা মণিকা সেনের নামটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মণিকা সেন খামটাকে গালে ছোঁয়াল। যতক্ষণ চিঠিটা না পড়ছে ততক্ষণ মানব মজুমদারের সঙ্গ পাওয়ার অধিকার তার আছে। খামটাকে গালের ওপর আরো জোরে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে রইল। মানব মজুমদারের হাতের স্পর্শ পেয়েছিল একদিন। সেই স্মৃতিটা ফিরে এল আজ। মনে হতে লাগল মানব মজুমদার বুঝি তার হাতখানা গালের ওপর রেখেছে।

চিঠি পাওয়ার পর থেকে মণিকাসেন বারে বারে নিজেকে বলেছে কি লিখেছে মানব মজুমদার আমি জানি। তবু কৌতূহল একটা ছিলই সেটা

এতক্ষণে বেলুনের মতো একটু একটু হাওয়া খেয়ে ফুলে উঠেছে। দুর্বল মানুষ যেমন সিদ্ধান্ত পাল্টায় এবং প্রতিবারেই নতুন যুক্তির ভিতে নতুন সিদ্ধান্তের ইমারত গড়ে তোলে মণিকা সেনও তেমনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে ক্ষতি কি? মানব মজুমদার তো আর ওর চোখের রঙ মুখের রেখা দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং ওদের সুখী জীবন কামনা করে ও চিঠির উত্তর দেবে। মানব মজুমদারকে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী দিতে পারে। এই ভেবেই খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে এনে চোখের সামনে ধরলো।

—এ কি! —চিঠিটা পড়তে পড়তে নিজের অজান্তেই মণিকাসেনের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল। চোখদুটো অসম্ভব জ্বালা করতে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল। চিঠিটা পড়া শেষ হতে আপনা থেকেই মণিকা সেনের চোখ দুটি বুজে এল। একটা নিদারুণ মর্মভেদী হাহাকার বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল।—না না এ আমি চাইনি।

ঘরের বাইরে বাতাস কাঁদছে আকাশ কাঁদছে একা ঘরে মণিকা সেন ও কাঁদছে। চোখের জল আজ অফুরাণ।

খামটা ছেঁড়ার পর ভেবেছিল মণিকা সেন চিঠি পড়েই উত্তর লিখতে বসবে। কিন্তু সেদিন তো নয়ই আরো কয়েকটা দিন কেটে গেছে তবু লিখতে পারেনি যদিও অনুভব করেছে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি একটা দেওয়া উচিত।

খিম্পু থেকে ফেরার দিনই মুন্টসোলিং এর কাছাকাছি জিপ এ্যাকসিডেন্টে মানব মজুমদারের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। এ ছাড়া মুখে এবং শরীরের নানা জায়গায় সেলাইয়ের দাগ। মানব মজুমদারের ভাষায়, তিনমাস শিলিগুড়ির হাসপাতালে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিছলাম। সাপ দেখে লোকে যেমন ভয় পায় আমাকে দেখে সুপ্রিয়া তেমনি ভয়ে আঁতকে উঠে পালিয়ে গেল ঘরের ভিতরে। নিদারুণ গ্লানি নিয়ে অনেকক্ষণ ওদের বৈঠকখানায় বসে ছিলাম। এক সময় চাকর এসে খবর দিল দিদিমণির শরীর খারাপ আজ আর দেখা হবে না। আমার ঘর থেকে আয়না সরিয়ে ফেলেছি। দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোইনা। খুব ইচ্ছে করে তোমার কাছে যেতে কিন্তু তুমিও তো সুপ্রিয়ার মতোই আমার বিকৃত রূপ দেখে ভয় পাবে, দূর করে দেবে আমায়।

দিনের পর দিন কেটে যায়। কী লিখবে মণিকা সেন ভেবে পায় না। একদিন বিকেলে নদীর পারে বসে নদীর জলে নিজের ছায়া দেখছিল মণিকা

সেন। নিচু হতেই মুখের ছায়া ভেসে ওঠে নদীর জলে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই মুখ স্রোতের টানে এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে যায়। হঠাৎ দূরের পাহাড়ের গায়ে রামধনুর দিকে দৃষ্টি পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ড্রাইভার কৃষ্ণমণির কথা। প্রথম দিন থিম্পু আসার পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে কৃষ্ণমণি ওকে রামধনু দেখিয়েছিল আর বলেছিল, জানেন ভুটিয়াদের বিশ্বাস রামধনু হচ্ছে স্বর্গমর্ত্যের সৌভাগ্যের সেতু, রামধনুকে তাই ওরা স্বাগত জানায়।

মণিকা সেনের মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। হ্যাঁ মানব মজুমদার এখন ওর। একান্তই ওর। হাতবাড়ালেই বন্ধুকে সে পেতে পারে। কিন্তু দিনের আলোয় যার মুখের দিকে তাকাতে পারবেনা সেই বিকৃত দর্শন মানুষটিকে নিয়েও কী করবে? না না রামধনু তার কাছে মোটেই সৌভাগ্যের দূত নয়।

ঘরে ফিরে চিঠি লিখতে বসেছিল মণিকা সেন। নিছক সহানুভূতি জানানো একখানা চিঠি। চিঠি কিন্তু লেখা হয়ে উঠছিল না। শুধুই কাটকুটিতে পাতা ভরে উঠছিল। মুহূর্তের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। একটা কালোছায়া ঘরে ঢুকে সুইচটা অফ্ করে দিল। ছায়াটা অন্ধকারে দরজার সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা সেনের কলম থেমে গেল। নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল ওর চেতনা।

অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরে নিঃশ্বাসের ভারীশব্দ নৈঃশব্দের ধ্যান ভঙ্গ করে চলেছে। কিছু পরে মানব মজুমদারের গলা শোনা গেল।

—জানো মণিকা সেদিন গর্বভরে বলেছিলাম আমি ক্ষমা চাইনা, আমাকে অভিশাপ দিও। আমার সব গর্ব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আমি দীন। তোমার কৃপা চাইতে এসেছি।

আবার নিঃশ্বাসের ভারীশব্দ। রাত্রির গভীরে থিম্পু শহরে নদীর শব্দের মতো।

মণিকা সেন, কী বলবে মানব মজুমদারকে? চিন্তাগুলো যেন ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে একটা আকৃতির মধ্যে ধরতে পারছে না মণিকা সেন। অনেক পরে মনটাকে আয়ত্তে এনে শান্তগলায় বলল, মানব সুইচটা অন করে ভেতরে এসে বসো। এ্যাকসিডেন্টে তোমার মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে তার জন্যে মনটাকে দীন করছো কেন? এমন তো কতলোকেরই হয়।

লাইট জেলে মানব মজুমদার ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসলো। মণিকা ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, তুমি ক্লান্ত, আমি আগে চা করে আনি। মানব মজুমদারকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মণিকা সেন পাশের ঘরে চলে এল।

বুকটা অসম্ভব কাঁপছে, মণিকা সেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, দেয়ালে

চেয়ার দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। প্রথম স্টেজ নেমে ঠিক ঠিক সংলাপ বলার পর উইংস-এর পাশে ফিরে এলে যেমন হয় মণিকা সেনের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য মনটা প্রস্তুত করে নিল মণিকা সেন। স্টোভ জেলে চা করল।

চা নিয়ে ফিরে এসে সেদিনের মতো টেবিলের একধারে মানব মজুমদারের মুখোমুখি বসলো। এবার তাকাল মণিকা সেন ওর মুখের দিকে। মানব মজুমদারের দুটি চোখই কালো চশমায় ঢাকা। থুতনির কাছে কাটা দাগ। কালো কালো ছোপ গালের দু'পাশে। তেমন বীভৎস মনে হল না মণিকা সেনের যেমনটি ওর চিঠি পড়ে মনে হয়েছিল।

মণিকা সেন শান্তভাবে বলল, তুমি কি জয়েন করেছ ?

—না আরো তিন মাস ছুটি নিয়েছি।

—কোথায় উঠেছ ?

—সুইস হোটেলে।

মণিকা সেন চোখে মুখে খুশির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, মানব তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে একটা খবর শুনে। দাদা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। পাত্র নাকি এই পোড়ারমুখীর ফটো দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। দাদা লিখেছেন কতদিন আর এভাবে একা একা থাকবি। ভেবে দেখলাম সত্যি মেয়েদের জীবনে একজন সঙ্গী দরকার। দাদাকে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে জানি। দু' চারদিনের মধ্যেই আমি দিল্লী রওনা হচ্ছি।

মানব মজুমদার কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলেছিল। হাত থেকে কাপটা পড়ে গেল, গরম চা ছিটকে পড়ল দু'জনেরই গায়ে। কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা উপলব্ধি করার মতো অবস্থায় তখন কেউই নেই।

মানব মজুমদার উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি তাহলে আসি।

—এখনি যাবে। শান্ত শীতল গলার স্বর মণিকা সেনের।

মানব মজুমদার দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মণিকা সেন ছুটে গিয়ে মানব মজুমদারকে ডেকে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু পারলনা। কে যেন ওর গলা টিপে ধরেছে, তাই স্বর বেরোলোনা আর পা দুটো পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। ঝড়ে যেমন বড়গাছ ভেঙে পড়ে মণিকা সেনের শরীরটা তেমনি চেয়ারের পাশেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁপতে লাগল শরীরটা, সঙ্গে চাপা কান্নার শব্দ।

সূর্যসন্ধান

অসিত গুপ্ত

রঞ্জুর আজ জন্মদিন।

সতেরো বছর রঞ্জু বেঁচে নেই। শরীরে বেঁচে আছে কিন্তু তাকে বেঁচে থাকা বলে না। এর চেয়ে মরে গেলে ভালো হত। শোক একবারই পেতে হত। সতেরো বছর ধরে দিনে-দিনে শোক, কষ্ট, যন্ত্রণা এসব পেতে হত না।

তবু ছেলের জন্মদিনের কথাটা ওঁদের মনে ছিল। কয়েক বছর তো ভুলেই ছিলেন। ভীষণ বাড়াবাড়ি চলছিল তখন। সামলে রাখাই শক্ত হয়ে উঠেছিল।

ঘুম থেকে উঠেই রঞ্জু একনাগাড়ে বকত, রাত পর্যন্ত বকুনি থামত না। খেত না, খেলেও আঁচাত না। এঁটো হাত গামছায় মুছে ফেলত।

কোনদিন রাতেও ঘুম হত না। রাতেও চেঁচাত। পাড়া-পড়শীরা কত বিরক্ত হয়েছে। ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে নিস্তেজ করে ফেলতে হত।

এইসময় আবার রঞ্জুর বাবার চাকরি থেকে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। এমন কিছু চাকরি ছিল না, তবু যা হোক ছিল তো! মাস গেলে দুটো পয়সা আসত। এখন ভরসা শুধু প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ক'টা। কিন্তু কলসির জল কেবল গড়িয়ে চললে কতদিন আর থাকে!

এক মেয়ের পর এই ছেলে। মেয়েটার যাহোক করে তবু বিয়ে দিয়েছিলেন। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা অবশ্য মেয়েকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দেয়। অভাব, অনটন ছেলের শোকে তাঁরা কিছু করতেও পারেন না। তাই মেয়েকেও তারা বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেয়নি।

ছেলেটার ওপর ভরসা ছিল। ও মানুষ হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই দিদিকে দেখবে, বুড়ো বয়সে বাপ-মা'কে দেখবে। কিন্তু সতেরো বছর আগে সেই ছেলেই অমানুষ হয়ে গেল।

রঞ্জু আজ হাসপাতালে। আজ তার জন্মদিন।

ওঁরা তাকে দেখতে যাবেন। সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে চান। কিছু দিতে

হবে। কি দেওয়া যায় সেটাই ভাববার বিষয়। খুব সাবধানে, ভেবে চিন্তে দিতে হবে। শেষে হিতে বিপরীত না হয়।

এমনিতে পৃথিবীর কোন কিছুতে ওর আকর্ষণ নেই। সুখ ওর শত্রু। সুখের জিনিস ওর কাছে তুচ্ছ খেলনার বাড়া কিছু নয়।

রঞ্জুর মা সংসার থেকেই একটু একটু পয়সা আলাদা করে জমিয়ে রেখেছিলেন।

একটা ট্রানজিস্টর কিনে দিতে পারতেন। নানা দামের তো হয়েছে আজকাল। হয়তো গান-টান শুনে মনটা একটু ভালো থাকত।

কিন্তু তাও কি দেওয়া যাবে? হয়তো যন্ত্র দেখলেই ওর ভয় করবে। মনে করবে, শত্রুর এ এক নতুন চক্রান্ত। আর গান বাজনা।

জগতের সব গান-বাজনার উৎস তো সে-ই। তাকে ঘিরেই তো যত গান-বাজনা রচিত হয়। একমাত্র সে-ই তো তৈরী করে। কালিদাসের কাব্য কিংবা রবি ঠাকুরের গান তাও তো তারই হাতে তৈরী।

ওঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে পরামর্শ করছিলেন। ছেলেকে কি দেওয়া যায়! অবশ্য রঞ্জুর মা'র স্বামীর কাছ থেকে কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। পরামর্শও নয়।

কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছেন রঞ্জুর বাবা। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকেন। কোন কাজ বললে করতে চান না। অদ্ভুত বেখাপ্পা সব যুক্তি দেখাতে থাকেন। অথচ রঞ্জুর মা যদি নিজে কিছু করেন, তাও তাঁর পছন্দ হয় না। তাই নিয়ে মহা অশান্তি জুড়ে দেন।

'তাহলে কী দিতে বল?' রঞ্জুর মা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই তো ভাবনা। আচ্ছা খাবার দাবার কিনে দিলে কি হয়?'

'খাবার দাবার! খাবার না হয় হাতে করে নিয়ে গেলে কিন্তু ও খুশি হয় এমন কিছু একটা দিতে পারলে ভালো হত না?'

'হত। কিন্তু ও যে খুশি হয় না আজকাল……অনেকদিন।' রঞ্জুর বাবা চেয়ারে বসে পড়লেন ধপ্ করে। তাঁর তলাকার ঠোঁট ঠুকঠুক করে কেঁপে উঠল।

কপালে হাত দিয়ে তিনি চোখের পাতা আড়াল করলেন।

স্ত্রী দাঁড়ালেন জানালার দিকে মুখ করে। প্রায় পূর্ণচ্ছেদের মতো। তাঁর চেহারা ক্ষীণ। তবু আশ্চর্য সোজা আছেন আজো। ধোপার খরচ বাঁচাবার জন্যে হাতে কাচা ময়লা-ময়লা কাপড়। মাথায় চুল আছে কিন্তু তাতে শেষ

'আচ্ছা, তাই চল। এক বাক্স মিষ্টি বরং কিনে নেওয়া যাবে। আর, একটা ছিটের শার্টও কিনে নিই, কেমন ?'

'শার্ট !' রঞ্জুর বাবা যেন থই পেলেন না। 'শার্টের মাপ পাবে কোথায় ? কতদিন দেখিনি। ওর চেহারাটা তো ভালো মনে নেই। আচ্ছা রোগা না মোটা বল তো আমাদের রঞ্জু ?'

'দিন দিন তুমি যেন কি হয়ে যাচ্ছ ! আমার তো বেশ মনে আছে।'

'তাহলে যাবার সময় স্টেশনের কাছ থেকেই জামা কিনে নেওয়া যাবে'খন। তুমি নিজে মাপটা দেখে নিতে পারবে। আমার তো চেহারাটা কিরকম গুলিয়ে যায়। তবে এর আগেকার চেহারা আমার খুব মনে আছে। বেশ ফর্সা ছিল রঞ্জু, তাই নয় ? আর যাকে বলে উজ্জ্বল স্বাস্থ্য……'

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী হাতে এক বাক্স মিষ্টি আর নতুন কেনা ছিটের শার্ট নিয়ে ব্যাণ্ডেল লোক্যালে চাপলেন। আকাশে তখন রোদ ছিল। গাড়িতে বেশ ভিড়। রঞ্জুর মা এক কোণে জড়সড় হয়ে বসলেন। রঞ্জুর বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতে ছাতা, কপালে ঘাম। কেউ তাঁকে বসতে একটু জায়গা ছেড়ে দিল না। গাড়ি চলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টলতে লাগলেন। টাল সামলাতে না পেরে পাশের লোকের ঘাড়ে পড়েও গেলেন বার দুয়েক।

লোকটি মুখে কিছু বলল না। কিন্তু তার তাকানো দেখেই বোঝা গেল, সে বিরক্ত হয়েছে। রঞ্জুর বাবার মনে হল, তাঁদের তিন কূলে কেউ নেই। এই যে ট্রেন জুড়ে এত লোক চলেছে এরাও তাঁদের কেউ নয়। তাঁরা একেবারেই একলা। এতদিন এখানে রয়েছেন, তবু দেখলে মনে হবে, তাঁরাই বুঝি বাইরে থেকে এসেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্মের বাইরেই তো আছেন তাঁরা।

তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রঞ্জুর বাবা কেবল ঘামতে লাগলেন।

মানকুণ্ডু স্টেশন এখনো আসেনি। তবু আগে থেকেই তাঁরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি স্টেশন পেরিয়ে যায়। আসা তো হয় না এদিক পানে। এদিকে কেন, এক অশেষ যন্ত্রণার পাক খাওয়া ছাড়া আর কোনদিকেই যাওয়া হয় না। রঞ্জুর মা তো কতদিন পরে বাড়ি ছেড়ে বেরোলেন। যেন এক যুগ।

ওভার ব্রীজ-এর তলা দিয়ে যাবার সময় রিক্সাওয়ালারা ছেঁকে ধরল।

'যাবেন বাবু ?'

'না বাবা, আমরা এই হাসপাতালে যাব।'

জায়গাটা খুব শান্ত, নিরিবিলি। গাছটাছ আছে। সেই কারণে বোধহয় একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

ফটক পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে ওঁরা উঠে গেলেন রেসিডেন্ট সার্জেন-এর ঘরে। ছেলের নাম বললেন।

রঞ্জুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে এখন।'

ডাক্তার বললেন, 'একই রকম। মাঝে প্রেসারটা একটু বেড়েছিল।'

রঞ্জুর বাবা খাতায় সই করে দিলেন। ডাক্তারটি স্লিপ লিখে দিলেন। ভেতরে যাবার ছাড়পত্র।

ডাক্তার বলে দিলেন, 'কেমন দেখলেন, এসে মতামতটা লিখে যাবেন।'

স্বামী-স্ত্রী হাসপাতালের চত্বরে প্রবেশ করলেন। বাড়িটা ভালো-ই। সামনে অনেকখানি খেলার মাঠ। বড় বড় আম-জাম, কাঁঠাল গাছ। তলায় দু'একটি বেঞ্চি পাতা।

চিরকুটটি দারোয়ানের হাতে দিয়ে ওঁরা বসে রইলেন গাছের তলায়। উদ্‌গ্রীব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে।

কেমন দেখব কে জানে!' রঞ্জুর মা খুব আস্তে বললেন। যেন কেউ শুনতে পাবে। কিংবা জোরে কথা বললে কারুর ঘুম ভেঙে যাবে।

'আমি তো বোধহয় চিনতেই পারব না।' হাতের একটা শিরা দপদপ করতে লাগল রঞ্জুর বাবার। 'স্মৃতি এত কমে যাচ্ছে কেন বল দেখি? কিছুই মনে করতে পারি না আজকাল।'

'আঃ চুপ কর।' স্ত্রী থামিয়ে দিলেন।

রঞ্জুর বাবা ছাতাটা এ-হাত থেকে ও-হাত করলেন। হঠাৎ হাওয়া দিতে লাগল। একটু ঝড়ো হাওয়া। ধুলো উড়ে এলো। তার সঙ্গে শুকনো পাতা মড় মড় করে। আকাশের একপাশে মেঘের আভাস। আলোও যেন একটু কম কম মনে হল।

'আমাদের বিয়ের কালটা পর্যন্ত ভুলে গেছি।' রঞ্জুর বাবা ঝরা পাতার শব্দ শুনতে শুনতে বললেন। 'সেদিন কত মনে করবার চেষ্টা করলাম। মনে আছে নাকি তোমার?'

'আঃ, এখন কি এসব কথা বলবার সময়। এখুনি হয়তে, রঞ্জু এসে পড়বে।'

রঞ্জু—এলো। সঙ্গে একজন সিসটার। দাড়ি কামায়নি। মাথায় চপচপে

তেল কিন্তু চুল আঁচড়ায় নি। চোখে চশমা নেই। পাজমা আর গেঞ্জী পরে আছে। পাজামার দড়িটা হাটু পর্যন্ত ঝুলছে।

'একি আমাদের রঞ্জু? ওর না চোখে চশমা ছিল!, রঞ্জুর বাবা স্ত্রীকে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

রঞ্জুর মা উত্তর দিলেন না। তিনি যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন ছেলের কাছে।

'কেমন আছ বাবা রঞ্জু?

রঞ্জু কোন জবাব দেয় না। ওঁদের মুখে কি যেন খোঁজে। খুঁজেই চলে খানিকক্ষণ। ওর মা খাবারের বাক্সটি ওর হাতে দিতে গেলেন। ও নিল না। বাক্সটির দিকে হেঁট মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশেও যেন কিসের ইঙ্গিত পেয়েছে। যেন অদৃশ্য কোন আহ্বান শুনেছে। অপরাহ্ন-বেলার ম্লান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ও কি সব বলতে লাগল। সূর্যের সঙ্গে বলতে লাগল। ঝড়ো হাওয়ায় ছড়িয়ে দিল তার কথা। যেন আকাশে কোন খবর পাঠাচ্ছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে সংকেতে হাত নাড়ল, বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গী করল। শেষে কোন্ দূর দিগন্তে আঙুল তুলে দেখাল।

আবার হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়াল।

রঞ্জুর বাবা এগিয়ে গেলেন। আলতোভাবে হাত রাখলেন ছেলের পিঠে।

'বাবা রঞ্জু, আমরা তোমার বাবা-মা। তোমাকে দেখতে এসেছি।'

রঞ্জু কোন উত্তর দিল না। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের হাতের আঙুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উল্‌টে পাল্‌টে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল আঙুলগুলো।

'তোমার মা-র সঙ্গে একটু কথা বল বাবা। নইলে তোমার মা ভীষণ কষ্ট পাবেন।'

তবু রঞ্জু জবাব দিল না। যেন শুনতেই পাচ্ছিল না কোন কথা। একটু পরে সামনের জাম গাছটার দিকে তাকিয়ে কি মনে করে হেসে উঠল। হাসিটা সম্পূর্ণ তাতে দ্বিধা বা সংশয় নেই। অপ্রস্তুতা নেই। বরঞ্চ আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আছে।

'আজ আর ওকে না ঘাঁটানোই ভালো।' সিস্টার বলল।

'আমরা এতদূর থেকে এলুম।' রঞ্জুর বাবা বললেন। 'আজ আবার ওর

অন্যদিন।' 'আর একদিন আসবেন বরং। দেখেছেন না, কথাই বলতে চাইছে না। বেশি জোরজার করলে এরপর ক'দিন হয়তো বাড়াবাড়ি যাবে।'

'না, তার দরকার নেই।' রঞ্জুর মা ডুকরে উঠলেন। 'আমরা চলেই যাচ্ছি। ওর জন্যে এই খাবারটুকু আর জামাটা এনেছিলুম। এগুলো কি রেখে যাব?'

'ইচ্ছে করলে রেখে যেতে পারেন। অফিসে জমা করে দিন। কিংবা এরপর যেদিন আসবেন, সেদিন নিয়ে আসবেন।'

সিসটারের হাত ধরে চলে গেল রঞ্জু। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। আকাশে তখন বেশ মেঘ করেছে। ম্লান আলোটুকুও নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

ওরা খাবারের বাক্স আর সার্টটি অফিসে জমা করে দিলেন। রঞ্জুর বাবার একবার মনে হল, যার জিনিস সে হাতে পাবে তো? কিন্তু সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দিলেন।

খাতায় লিখতে যাচ্ছিলেন রোগীর অবস্থা একই রকম। রঞ্জুর মা বোধহয় তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, 'জিনিসগুলো ওঁদের হাতে দিয়ে দাও। আর খাতায় লেখ, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ।'

স্বামী তাই লিখে দিলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন অফিস-ঘর থেকে। বেরুবার আগে তিনি একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন দোরগোড়ায়। ছাতাটা হাত-বদল করে এক মুহূর্ত কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করলেন। তারপর ইতস্তত ভাব কাটিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওকি আর কোনদিন ভালো হবে না?'

কথা ক'টা বলতে গিয়ে তাঁর ভীষণ কষ্ট হল। গলা ধরে উঠল। তিনি মুখ ফেরালেন। উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না।

বাইরের আকাশ তখন ঘোলাটে।

কম্পাউণ্ড পার হবার আগেই দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। একটি লোক ঢুকছিল। ফটকের কাছে লোকটি ওদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বাবু আপনি রঞ্জুবাবুর বাবা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা। তুমি কে?' রঞ্জুর বাবার গলায় উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ। রঞ্জুর মা-ও এগিয়ে এলেন। ছেলের বিষয়ে একটু খবর পাবেন এই আশায়।

লোকটি বলল, 'আমি বাবু রঞ্জুবাবুকে দেখা শোনা করি।'

'ও। তা কেমন বুঝছ বল তো? কবে বাড়ি যেতে পারবে?'

রঞ্জুর বাবা আগ্রহে লোকটির হাত চেপে ধরলেন।

'ভালো হয়ে যাবে বাবু। শীগ্‌গিরই বাড়ি যাবে, দেখবেন। মাঝে-মাঝে একটু যা গণ্ডগোল করে। নইলে রঞ্জুবাবুর মাথা খুব সাফ। খুব বুদ্ধি। এমন বুদ্ধি এখানে আর কারো নেই। বড় বড় আঁক কষে। ইংরেজী লেখে। কিছু চিন্তা করবেন না।'

রঞ্জুর বাবা লোকটির কথায় খুব আনন্দ পেলেন। 'হ্যাঁ, তা বটে। বুদ্ধি ওর ছেলেবেলা থেকেই। লেখা-পড়ায় খুব ভালো ছিল তো! তাহলে বাবা, তুমি বলছ আমাদের রঞ্জু তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে?

'হ্যাঁ, বাবু। আমি বলছি দেখবেন।'

'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

'ও আমাদের রঞ্জুকে দেখা-শোনা করে, ওকে কিছু দাওনা!' রঞ্জুর মা বললেন।

'হাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

রঞ্জুর বাবা ডবল কফ শার্ট-এর বুক পকেট থেকে একটা স্যাকড়ার থলি বার করলেন। রঞ্জুর মা-র হাতেই তৈরী। তার থেকে খুঁজে পেতে আট আনা পয়সা বার করে দিলেন লোকটির হাতে।

এই সময় ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। স্বামী ছাতা খুলে স্ত্রীকে বললেন, এস ছাতার তলায় এস।

ওঁরা যখন স্টেশনে এসে দাঁড়ালেন তখনো ট্রেণের বেশ দেরী রয়েছে। ভেবে গিয়েছিলেন ছেলের কাছে খানিকক্ষণ থাকবেন। কথাটথা বলবেন। নিজেরা হাতে করে একটু মিষ্টি খাইয়ে আসবেন। তারপর ট্রেণ আসার মুখে মুখে স্টেশনে এলেই চলবে। সেই ছেলের কাছেই থাকা হল না। নিজের জন্য তত নয়। রঞ্জুর মা'র জন্য কষ্ট হতে লাগল রঞ্জুর বাবার।

স্বামী-স্ত্রী ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'টি নির্বাক, নিরর্থক যতি চিহ্নের মতো। ওঁদের ঘিরে নিঃশব্দে বৃষ্টি হয়ে চলেছিল। স্টেশন জনশূন্য। একটি ছেলে কেবল আপন মনে বৃষ্টিতে খেলা করছিল। গাছপালায় টুপটাপ জল ঝরছিল।

'ফিরতি ট্রেণ কখন আসবে? স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন রঞ্জুর মা।

'এই তো আর ক'মিনিট।'

'আসবে তো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ট্রেণ আসবে না !'

'মঞ্জু কি কক্ষনো বাড়ী আসবে না !'

হঠাৎ এতক্ষণ পরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মঞ্জুর মা। চোখ দিয়ে তাঁর দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

তখনো ছেলেটা বৃষ্টিতে সমানে খেলা করছে।

১লা অক্টোবর ১৯৭৩ প্রকাশিত হবে

বাংলা কবিতা

শরৎকালীন সংকলন

লিখেছেন

রমেন্দ্র আচার্য চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সামসুল হক, বেলাল চৌধুরী, শান্তি লাহিড়ী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সুনীথ মজুমদার, রথীন মজুমদার, সুশান্ত বসু, বিমল রায় চৌধুরী, মণীন্দ্র গুপ্ত, সমীর দাশগুপ্ত, সমীর রায় চৌধুরী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিদীপা বিশ্বাস, কালীপদ কোঙার, বিনোদ বেরা প্রভৃতি।

অশোকের অনুশাসন

শান্তি লাহিড়ী

পুড়ে গেলেও ছাই চাপা ছিল কিছু আগুন। ব্রজমাধব নিজেও সেকথা জানতেন না।

লণ্ঠন জ্বলছিল তক্তপোষের নিচে। টিমটিমে। ব্রজমাধব আলো-আঁধারি আর গুমোটে শুয়ে শুয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছিলেন। পাশে, বিছানার ওপর আজকের খবর-কাগজ। গান্ধী-স্মারক প্রকাশিত মহাত্মাজীর একখণ্ড রচনা, তার এক পাতায় পঠন চিহ্ন। ব্রজমাধব কখনো চোখ বুজে কিছু ভাবছেন, কখনো চোখের পাতামেলে জানালা দিয়ে বাইরে বস্তির মোড়ে তাকাচ্ছেন। দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা আছে। কি নেই ঠিক ঠাহর করা যায় না।

বিন্দু পাশের একফালি বারান্দায় রুটি সেঁকছেন। ওটাই হেঁশেল। ছেলে কাজ থেকে এখনো ফেরেনি।

একটা কিছুর শব্দ পেয়ে ব্রজমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, এলি ?

বাবীন বাবার কথার কোন জবাব দিল না। ঘামে ভেজা শরীর থেকে পাঁঠার ছাল যেমন ছাড়ায়, তেমনি ময়লা পাঞ্জাবিটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর গেঞ্জীটাও। গামছা কাঁধে ফেলে লুঙিটা হাতে নিয়ে উঠোনের একদিকে, যেখানটায় জলের টিন রাখা থাকে, সেদিকটায় চলে গেল। যাবার সময় মাকে আড়চোখে একবার দেখল। মাকে দেখল আর মার একটা কথা মনে পড়ে গেল। 'এবার একটা বৌ আন বাবীন, আমার কষ্ট হয়।'

বিন্দু ছেলেকে দেখলেন। আর ওই একই কথা আজ আবার মনে মনে ভাবলেন 'এবারে একটা বৌ আনলে পারে বাবীন, আমি আর পারি না।'

ব্রজমাধব নামলেন তক্তপোষ থেকে। খড়ম পায়ে দিয়ে লণ্ঠনের আলোটাকে একটু দীপ্ত করে দিলেন। একবার কাশি এলো গলার মধ্যে, ব্রজমাধব সামলে নিলেন। ছেলে পছন্দ করে না। শুনেই বলবে, আপনার কাশি বেড়েছে বাবা, ডাক্তারের কাছে যাবেন কাল। ব্রজমাধব ভাবেন বারীন ঠিক বোঝে না, বয়স হলে কাশি হবেই, একবার উদাস হয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন, সুভাষ বোসের সমান বয়স হল। সে কি আজকের কথা! তাছাড়া তামাক একটা হেতুও বটে ও কাশির। বারীন হয়ত সেদিকটাকেও ইঙ্গিত করবে।

ব্রজমাধব বারান্দায় এলেন, যেখানটায় বিন্দু ছেলের জন্যে একখানা থালায় দুটো রুটির সঙ্গে একটু পেঁজ-আলু সাজিয়ে চা ঢালছেন পেয়ালায়। একটা ডাঁসামত বেতের মোড়া টেনে নিলেন ব্রজমাধব। তারপর স্ত্রীর দিকে তামাক সমেত কল্কেটা এগিয়ে দিলেন টিকেয় একটু আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে।

ব্রজমাধব আসলে না এসে পারেন না। দিনের শেষে ছেলে মা-র মুখোমুখি বসে দুটো কথা বলবে নিজেদের মধ্যে, ব্রজমাধবের মনে হয় তিনি বোধহয় বাদ পড়ে গেলেন ওদের ওই সুখটুকু থেকে। যেদিন না এসে একা বসে থাকেন ঘরে, সেদিন পরে তিনি কষ্ট পান। মনে হয় বিন্দু আর বারীন একটাই সত্তা, ব্রজমাধব বিচ্ছিন্ন। এ সংসারে এক পারম্পর্যহীন অস্তিত্ব মাত্র। বিন্দু স্বামীকে বোঝেন।

বারীন গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বাবার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ভেজা গামছা কাঁধে। উবু হয়ে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, আপনি তাহ'লে কাল যাচ্ছেন!

হুঁকায় নল হাতে ধরে ব্রজমাধব বলল, কোথায়!

সেতো আপনি ভালভাবেই জানেন।

ও হ্যাঁ। যাব বলেইতো স্থির করেছি! আজ ব্রজমাধব এখান থেকেই উঠে গেলেন। অর্দ্ধসমাপ্ত তামাক পুড়তে লাগল মিটমিট করে।

বিন্দু বললেন, তোর কেন আপত্তি বারীন। যান না উনি। সারা জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন। আজ একটা সম্মান দিতে চাইছে সরকার, তুই কেন অসন্তুষ্ট হচ্ছিস, আমিতো পাচ্ছিনা।

সম্মান!

সম্মান নয়? লোকে তো বিশ্বাস করতে চায় না যে উনি অসহযোগ করেছেন। কংগ্রেসের হয়ে, সুভাষ বোস মহাত্মাজী—এঁদের অনুগামী হয়ে

জেল খেটেছেন। বৃটিশের গুলি খেয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছেন। আজ তবু সবাই জানবে যে, মানুষটা শুধু ছেলে চড়িয়ে নন, একজন কেউকেটা।

চোখ মুছলেন বিন্দু। স্বামীকে নিয়ে যে অন্তরে তাঁর একটা গর্ব আছে সেই গর্বে হঠাৎ বাতাস লেগে গেছে। একটু খানি চাপা সুখ চোখের কোণায় চিক্ চিক্ করে উঠেছে তাই।

বারীন ছাত্র পড়াতে চলে গেল। সেখানেও সেই কথা। ছাত্রের বাবা বললেন, আপনার বাবাতো সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মারক পাচ্ছেন, তাই না?

স্বাধীনতা সংগ্রামী! বারীন মাথা নিচু করে আস্তে বলল, হ্যাঁ।

সেদিন রাত্রে কেউ কারো সঙ্গে আর কথা বলল না। বাবা-মা ও ছেলে —সবাই যে যার মত বিছানায় গেল।

বারীন ঘুমাতে পারছে না। একবার বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল, মনে হল ব্রজমাধব ঘুমাচ্ছেন। এই সেই ব্রজমাধব, যে নাকি বাঘা বাঘা ব্রিটিশ-পুলিশকে ঘোল খাইয়েছে। দেশের জন্য এমন কোন কাজ নেই যা না করেছে। এই সেই ব্রজমাধব যে কিনা মহাত্মাজীর কাছে চিঠি লিখেছিল, দেশ আবার ভাগ হয় নাকি! আর আজ সেই ব্রজমাধব একখণ্ড তামার ফলকের লোভে কাতর। পায়ে হেঁটে গিয়ে সম্মান নিতে হবে তাদের কাছ থেকে। যারা সেই ব্রিটিশ আমলে পিস্তল হাতে হাজার হাজার ব্রজমাধবের বুকে গুলি চালিয়েছে। ক্লাসে এখনো যখন বারীন স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ায় তখন মনে হয় এ কোন ইতিহাস নয়। স্বাধীনতার ইতিহাস অন্যরকম হওয়া উচিৎ ছিল। অন্য রকম!

সম্বর্দ্ধনা সভা ভরপুর। নানা বয়সের ভিখারীরা সেই সরকারী থালাটি হাত পেতে নিচ্ছেন—যাতে এক কণা তণ্ডুলও নেই। ব্রজমাধবের বসে বসে সেই কথাই মনে হল। কাল যখন বারীন শেষবার কথা বলল স্কুল থেকে ফিরে তখনো ব্রজমাধবের গলা কিছুটা শক্ত ছিল, বারীন লক্ষ্য করেনি। মহামান্য কালেক্টরের হাত থেকে রাজকীয় উষ্ণীষ নিতে হবে ব্রজমাধবকেও। ঠিক আছে। নেবে ব্রজমাধব। কিন্তু ওই কালেক্টর সাহেব ব্রজমাধবের খুব চেনা।

কোমড়ের ডানদিকটায় একবার হাত স্পর্শ করল ব্রজমাধবের। মনে হল, ব্রজমাধব চাটগাঁর একটা গ্রাম্য পার্বত্য পথ ধরে ছুটছে। আর ওই গ্রামের

থানার পুলিশ অফিসার মিঃ সেন গাছের মগডালে লুকিয়ে শিকার খুঁজছেন। মিঃ সেনের থানা এলাকায় সেদিন যুবকের গুলিবেঁধা শরীরের অভাব ছিল না। ব্রজমাধবের বাঁ হাতের তালুতে সেই পুরোনো গুলির দাগ আবার দগদগে হয়ে উঠল। রক্ত পুঁজ কষে পাঞ্জাবীর হাতা ভিজে যেতে লাগল।

নাম শুনে আগেই আন্দাজ করে ছিল ব্রজমাধব। সন্ত্রাসবাদী ব্রজমাধব এবং পরবর্তীকালে গান্ধীবাদী ব্রজমাধব আবার, জীবনের পশ্চিম বারান্দায় এসে অনুভব করল—শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে পর্যন্ত আগুন চাই, অস্ত্র চাই—আগ্নেয়াস্ত্র চাই। ছাই আর মরিচা মৃতের উত্তরাধিকারীদের কাজে লাগে সান্ত্বনা খোঁজার কালে।

কালেক্টার সাহেব চমকে উঠলেন, যখন ব্রজমাধব তামার পাতখানি নেবার জন্য বাঁহাত বাড়িয়ে দিলেন। এক পা পিছনে ফিরলেন কালেক্টর সাহেব। কিন্তু ব্রজমাধব ডান হাতে ছোট্ট একটুকরো মৃত্যুর ঘোড়া টিপলেন।

ব্রজমাধবের সম্মান কেড়ে নিলেন সরকার। ব্রজমাধব সন্ত্রাসবাদী! স্বাধীনতার আগে এবং পরেও।

অসমছন্দ

সত্যেন্দ্র আচার্য

আমার খুব অবাক লাগত এই মানুষটির কথা ভাবতে গেলে। হাসতাম। বুঝতাম বিভাসের কথা বলছে সুলতা। হাসতে হাসতে বলতাম, বিভাসের কথা বলছ সুলতা?

তোমার বিভাস বন্ধুটি আসছে না যে? সুলতা আমার চোখে তাকিয়ে তেমনি হাসত। বলত, কাশফুল ফুটিছেনা বোধহয়?

আশ্চর্য, কারণ বিভাস শুধু সারা বছরের ভেতর এই একটি সময় বেছে নিয়ে আসত। যখন কাশফুল ফুটত। যখন শরতের মাস শিউলি ঝরাত। বিভাস হাসি হাসি গলায় বলত, এই শরৎকালের যে কোন সকালে আমাদের সেই গভীর অরণ্যের ভেতর দাঁড়িয়ে কী যে আনন্দ পেতেন না সুলতা?

অথচ বিভাস, খুব অবাক হয়ে গেছি প্রথমে। না কাশফুল, না শিউলির সমারোহ এখন, অথচ বিভাস এসে হাজির। হাতে ইংরাজী নভেল, কাঁধের ওপর চিরাচরিত প্রথায় দামী ক্যামেরা লোড করা। ব্যাপার কি বিভাস?

বিয়ে।

বিয়ে? বিস্ময়ে উচ্চারণ করেছি।

হ্যাঁ। বিভাস খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল। কাঁধের দামী ক্যামেরা সন্তর্পনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

এই বিভাস চাকরী করত সরকারের বন বিভাগে। তাও সদর দপ্তরে নয়। একেবারে ফিল্ডে। অর্থাৎ গভীর বনের ভেতর। আমি আর সুলতা খুব অবাক চোখে বিভাসের চোখে তাকিয়েছি। কোথায় বিয়ে?

বিভাস মোটেই ক্লান্ত নয়। দু' একটা ঘামের বিন্দু কপালের ওপর দাঁড়িয়ে। দু' একটা চুল বা চোখের ওপর, ভুরুকে স্পর্শ করেছে। বিভাস আঙুলের বুরুসে তাদের কপালের ওপর ঠেলে দিয়ে বলল, জঙ্গলে।

বিভাস এবার আরাম করে বসল। এমনিতে খুব সুন্দর আর সুঠাম বিভাস। কলেজের শেষ ধাপ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আমাদের পাশাপাশি ঘুরত। বাংলা

দেশের ছেলে কিন্তু গল্প করত বিহারের। বাঘ, ভালুক আর মৌমাছির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করত। হিংস্র জন্তুদের সম্বন্ধে বলতে বলতে চোখদুটো কেমন হিংস্র হয়ে উঠত। আমাদের কাব্যচর্চাকে উপহাস করত বিভাস। মেয়েদের শরীরের বিজ্ঞাপনকে ঘৃণা করেছে। অথচ প্রেমকে সম্মান দিত বিভাস। এ হেন চরিত্রকে আমি চিনি বলেই বললাম, জঙ্গলে?

হ্যাঁ।

বিভাসের কথা মত এক চেঞ্জার সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিভাসের বিয়ে। এই বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ নয়, একেবারে নিতে এসেছে বিভাস। বিভাস খুব জোরে জোরে সিগারেট টানল। পা নাচাল। ঘন ঘন রুমাল নিয়ে মুখ মুছল। বলল, কেন, তোমাদের কী ধারণা ছিল? গলা তুলে হাসল বিভাস।

ফলে দুদিনের যাত্রা শেষ করে বিভাসের সঙ্গে আমরা বিভাসের এলাকায় এসে পৌছলাম। চারপাশে বন আর বন। গভীর অরণ্য। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। তারই ভেতর দিয়ে একটা বাঁধানো সড়ক। যে পথে জীপ আর ঘোড়া নিয়ে কিছু লোক দিনে শুধু যাতায়াত করে। প্রকৃতির এই অনাবিল সবুজের ভেতর, সৌন্দর্যের ভেতর বিভাসের বাংলো।

আমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে আমি আর সুলতা বিশেষ কোন আমন্ত্রিত বলে। সম্মানিত অতিথি বলে সম্পূর্ণ একটা কাঠের বাড়ি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিভাসের কৃপায় সুখের অন্ত ছিল না বলে, বিভাসকে আরো যেন ভাল লাগছিল।

এই ভাল লাগার ভেতর একজন লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অবাক চোখে আমি তাকালাম। এ বাড়িতে এখন কেউ নেই। সেই আশ্চর্য সুপুরুষ চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিনয়ে বললেন, বহুদিন পরে বেরিয়েছিলাম জঙ্গলে তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

কানের পাশে কিছু চুল এখনো সম্পূর্ণ পাকা নয়। কিন্তু দেহের ঋজুতা, চোখের তীব্রতা এবং চালচলন আমাকে খুব অবাক করে দিচ্ছিল। ভদ্রলোক চুরুটে টান দিলেন। দিয়ে বললেন, এখন বিশ্রাম করুন, পরে এসে আবার আলাপ করব। আজ আপনারা আমার পরম আত্মীয়। কোন ত্রুটি হলে নিজগুনে ক্ষমা করবেন।

ভদ্রলোক চলে গেলে এক ঝাঁক মেয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। গোটা দুই খুচরো। দুটি ভাল ফ্রকে আর পঞ্চমটি শাড়িতে নতুন বলে না কি, এক

কথায় দারুণ। আমার চোখের ওপর কাকাল ছড়াতে ছড়াতে বলল, আজ বাসরে আপনাকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করব কিন্তু।

তাতে কি, এখনি করনা।

ওরা ঢলাঢলি করে গায়ে পড়ে হাসল। আমার চোখ বিশেষ করে শাড়ির উঁচুনিচু ভাঁজে ওঠানামা করছিল। শাড়ি বলল, আচ্ছা, বলুন তো—

বল। আমি পৌরুষদীপ্ত গলায় বলেছি।

অবার ওরা গায়ে পড়ল। হাসল। হেসে ছড়া কাটল—

ও পাড়ার অই চৌকীদার—
তাকে দিলি চোদ্দবার,
এ পাড়ার এ পক্কা তিলি
তাকে বল কবার দিলি ?
ও বড় মানুসের ঝি,
একে দিলি তাকে দিলি, আমায় দিলি কি ?

ওরা ভেবেছিল আমি পারব না। আমি ওদের অবাক করে দিলাম। বললাম, এ খু-উ-ব সোজা।

বেশ তো বলুন না ?

ঘোমটা।

আরো অবাক হল ওরা। আচ্ছা, এবার বলুন, বলে আবার বলল—

বাপ দিলনা জন্ম মোর জন্ম দিল পরে
আমার যখন জন্ম হল মা ছিল না ঘরে।

এও খুব সোজা।

কি ?

লবের ভাই কুশের জন্ম বৃত্তান্ত।

উপ্, আপনি ভীষণ কড়া। সব পারেন। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি আবার কিচির মিচির করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে এবার একটি যুবতী মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাকিয়েই চোখ নামিয়েছি। মেয়েটি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, চিনতে পারেন ?

অবাক হয়েছি আমি।

পারেন না, না ? বড় ম্লান হাসল মেয়েটি।

যেন এও আর এক গোলকধাঁধা। ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। ঘরে কেউ নেই। চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। কথা বলতে গেলে কেমন যেন আটকে যাচ্ছিল। কোন উপায়ে একটা সিগারেট টেনে ঠোঁটে তুলেছি।

মেয়েটি খুব কাছে সরে এল। বিছানার ওপর পড়ে থাকা দেশলাইটা তুলে নিয়ে আমার সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিতে দিতে বলল, আগে না চুরুট খেতেন? বাবা যেমন খায়? এবার মেয়েটি আমার অসহায় অবস্থা বুঝে ফেলে বলল, ভয় নেই, এ ঘরে কেউ এখন আসবে না।

তবুও কথা ফুটছিল না ঠোঁটে।

কিসের এত ভয়? তারপর একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, বিয়ে করেছেন বলে?

আমি এবার তাকিয়েছি। আর কিছু বলল না মেয়েটি। খুব তাচ্ছিল্যে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি চলে গেলে আমার রক্তের ভেতর কেমন একটা জ্বালা যেন ছড়িয়ে পড়ল। ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিভাসের ওপর। উঁকি দিয়ে দেখলাম সূর্য ঢলেছে। রোদ এখন তেরছা হয়ে মোটা মোটা ছায়া নিয়ে গাছের নিচে লুটিয়ে আছে। পাশের ঘরে এখন সুলতার গলা শোনা গেল। বিভাস এসে ঢুকল।

বিভাসের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের চোখের ওপর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বন-প্রান্তর ভেদ করে। কিছু লম্বা সবুজ ঘাস, শাল আর মহুয়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিভাস আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা টিলার কাছে এল।

চারিদিকের এই বন্য পরিবেশের ভেতর বিভাসকে কেমন অদ্ভুত লাগছিল। বলল, সেই কলকাতার নিঃস্ব মেয়েটি আজ আমার সর্বস্ব। তুমি শুনলে অবাক হবে, মেয়েটির সঙ্গে একটি ছেলের প্রেম ছিল। তারপর মেয়েটির অসহায় অবস্থার কথা বলতে বলতে এক সময় হঠাৎ থেমে গেলে, আমাদের ঘিরে একটা নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। রোদের তেজ কমে আসছিল। শ্যামলা রং আর কিছু সবুজ গাছের ছায়া টিলাগুলোকে তখনো ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিভাস বলল, মেয়েটি বলেছিল, বল, এখন আমি কী করব, এ মুখ কী করে দেখাব।

কেন, ঘরে তো আয়না আছে। ছেলেটি হেসেছিল। কোথা থেকে কী সব করে এখন আমাকে দায়ী করছ? আমাকে হাত করতে চাইছ?

মেয়েটি চোখের জল মুছে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এখানে ফিরে এসেছিল। আবার থামল বিভাস। বাইরের এই হিমশীতল হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বিভাস নিঃশ্বাস নিল জোরে। শব্দ না করে হাসল। হেসে বলল, এ মুহূর্তে ছেলেটিকে যদি পেতাম, তার লাম্পট্য প্রবৃত্তির সঙ্গে আমার হিংস্রতার মালা বদল হয়ে যেত, না? সেই দৃশ্যের পাশে তুই আমি দাঁড়িয়ে তখন কি করতাম বলত?

With best Compliments from :

Avail Printers

Printers, Designers & Blockmakers

10, GOMES LANE, CALCUTTA-14
PHONE : 24-1452

কৃষ্ণচূড়ার নিচে

জহর সেনগুপ্ত

প্রতিদিন সকাল বিকেল মিলে কয়েক হাজার লোক যাতায়াত করে এই ছোট ষ্টেশন দিয়ে। ষ্টেশনের সামনে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে এক অন্ধবুড়ো তার বছর বারো বয়সের মেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করত। যারা নিত্যযাত্রী তারা রোজই দেখত সেই বুড়োকে, কেউ কোনদিন কয়েকটা পয়সা দিত কেউ দিত না। কিন্তু আশ্চর্য, বুড়ো কোন দিন 'বাবু একটা পয়সা দিন সারাদিন কিছু খাই নি,' এসব বলে কাউকে বিরক্ত করতো না। যা পেত দিনান্তে তাই নিয়ে মেয়ের হাত ধরে গাছতলাটা শূন্য করে চলে যেতো।

যে জায়গাটায় ও দাঁড়িয়ে থাকতো তার পিছনেই ছিল বিস্কাস্ট্যাণ্ড, রোজ দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনত খুচরো পয়সার টুং টাং আওয়াজ, মেয়েটা পলকহীন দৃষ্টিতে দেখত কতগুলো লোক গোল হয়ে বসে একের পর এক পয়সা ছুড়ে মারছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, তারপর ওদের মধ্যে একজন সব পয়সাগুলো নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে। ওর মধ্যে একজনকে ও খুব ভালোভাবে চিনতো, সে হচ্ছে গোকুল। জিতলে একটা দুটো টাকা মেয়েটার হাতে গুজে দিতো গোকুল বলত, নে—আজ সব শালাকে ফুতুর করেছি। তাসে যেন যাদু ছিল। মাঝে মাঝে মেয়েটাও গোল হয়ে বসে খেলা দেখত আর মনে মনে বলত সব পয়সাগুলো যেনো গোকুলদা পায়। আর বৃষ্টি নামলেই আসর ভেঙে সবাই দৌড় দিত। বৃদ্ধ শূন্যে হাতড়াতে হাতড়াতে চিৎকার করত—ওরে চম্পা কোথা গেলি; চম্পা দৌড়ে এসে বাবার হাত ধরে বলে, 'চেল্লাচ্ছ কেনো, এইতো আমি।' 'হারামজাদী কোথায় ছিলি বুড়ো বাবাকে একা ফেলে এদিক ওদিক নেড়ে বেড়াস্, একদিন দেখবি আমি পড়ে গিয়ে মরে যাবো, তখন বুঝবি।'

চম্পা মনে মনে বলে 'বেঁচে থেকে যা বোঝাচ্ছ মরে আর বেশী কি বোঝাবে—বাপ্।'

কৃষ্ণচূড়া গাছটার গোড়া আগাছায় ভরে আছে আর তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠছে একটা লজ্জাবতী লতা, চম্পাও তেমনি বাবা আর গোল আসরটার মধ্যেই বেড়ে উঠছে। লতা যেমন বেড়ে ওঠার সাথে সাথে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, নিজেকে প্রকাশ করে, তেমনি দিনকে দিন প্রকট ভাবে প্রকাশ হতে লাগলো চম্পার মেয়েলী দেহের অবয়ব। ও এখন আর সারাদিন বাবার কাছে ষ্টেশনে কাটায় না, মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক চলে যায়। ফিরে এসে বাবাকে একটা পাউরুটি দিয়ে বলে, জলে ভিজিয়ে খেয়ে নেও। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে, ওর গায়ের রং কালো বটে তবে দেহ ঠাসা গড়নে বাঁধা। ও হেটে চলে গেলে বিস্তা স্ট্যাণ্ডের ছেলেগুলো একটা ঢেউয়ের দোলা অনুভব করে। কেউ কেউ গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার তুলে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, 'কি হোল চল হে' এই যে বাবু যাচ্ছি-শালার বিড়িটা একটু ধরিয়ে নি।'

এখন চম্পা গোল আসরের সবাইকে চেনে, ওকেও সবাই চেনে। গোকুল আজকাল প্রায়ই হারে আর মুখ ব্যাজার করে গাড়ীটার মধ্যে সিঁদে বসে থাকে, প্যাসেঞ্জার নেবার জন্যে হাঁকডাক পারে না। চম্পা বলে, ও লাটসাহেবের বাচ্চা ভাড়া না খাটলে ঘরে গিয়ে খাবে কি? গোকুলের মেজাজ একেই বিগড়ে আছে, সে বলে ওঠে, তোর বাপের কিরে? আমি খাই না খাই তাতে তোর কি শালী। আঃ—হ্যাঃ—অত চোট কেন, হারলে যদি মাথা ঠিক না থাকে তবে খেলতে যাওয়া কেন? —চম্পা তোর ঢুলোনিপনা আমার ভালো লাগে না। গোকুলের মনটা যেন বলতে চায়—'চম্পা তুই ছোট ছিলি ভালো ছিলি, তোর দিকে কুকুরগুলোর নজর ছিল না। এখন সবার জিভটা লকলক করে ওঠে তোকে দেখে। তুই কেনো বুঝিস্ না, তোকে যে ওরা খাতির করে, তুই একেই ওরা সবাই তোর নামে পয়া করে পয়সা ছোড়ে বোর্ডে তারপর দান বাঁধলে আধা বখরা দেয় তাকি শুধু শুধু। ওদের গায়ে গা ঘিসে বসলে টের পায়না ওদের রক্ত কেমন চন্‌চনিয়ে ওঠে, তুই কেন বড় হলি? চম্পার দিকে তাকিয়ে ট্যাক থেকে একটা বিড়ি বের করে একমুখ ধোয়া ছাড়ে, ধোয়ার কুণ্ডলিটা আকাশে মিলিয়ে যায়। গোকুল কিছুই বলতে পারে না।

বুড়োটাকে এখন আর কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দেখা যায় না, সেখানে একটা দোকান হয়েছে, গাছটাও বুড়িয়ে গেছে আগের মত ওর সবুজের জৌলুস

নেই, আর লজ্জাবতী লতাটা লজ্জায় মাথা খেয়ে কবে শুকিয়ে গেছে কে জানে। স্ট্যাণ্ডে গাড়ী অনেক বেড়ে গেছে, ওর মধ্যে কয়েকটা ছোকরার চেহারার আদলটা ভিন্ন ধরনের, ওরা মধ্যে মধ্যে আবার ইংরেজী বলে, কখনো কখনো ভাঙা গলায় বেসুরে গান গায়, আর প্যাসেঞ্জার এলেই হই হই করে লাফিয়ে পড়ে। কোন বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কে জানে, সব বিড়ালের ভাগ্যেই তো আর শিকে ছেড়ে না, তাই যে ভাড়া পায় সে আধ খাওয়া বিড়িটা পাশের ব্যর্থ নায়কের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—নে বে টান, আমি চলি।

গোকুলের গাড়ীটা পুরোণো হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় ভেঙেও গেছে, নতুন একটা গাড়ী নেবে ভাবে, আজকাল স্ট্যাণ্ডে অনেক চকচকে গাড়ীর আমদানী হয়েছে। এদের মধ্যে গোকুলের গাড়ীটা ঠিক মানায় না—তা গোকুল বোঝে কিন্তু কি করবে। মালিকের পাওনা না মেটালে নতুন গাড়ী নেবে কি করে? —আজকাল শালা বাজার দারুণ কম্‌পিটিশনে চলছে। নতুন ছোঁড়াগুলো কথা বলতে জানে প্যাসেঞ্জারগুলো ওদের কাছে পটে ভালো। গোকুলের দিন কাটছিল চালের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জলে ভিজে, সারারাত বসে ঘটি ঘটি জল খেয়ে, কোনদিন আধপেটা পাউরুটি খেয়ে।

চম্পার সাথে আজকাল আর বেশী দেখা হয় না গোকুলের। মাঝে মধ্যে ঝলক দিয়ে চলে যায়।

একি চম্পা না? গোকুল দেখলো, খোঁপায় ফুল গুঁজে আড়াই প্যাচে শাড়ী পরে খুসীতে ডগমগ হয়ে পান চিবোচ্ছে চম্পা আর বাজারের চালের ব্যবসায়ী হারাণ সাহার সাথে দুলে দুলে কি যেন বলছে। গোকুলকে হাতের ইশারায় দাঁড়াতে বলে। ভীষণ রাগ হলো, তবুও দাঁড়ায় গোকুল। চম্পা এবার এদিকেই আসছে, আর হাত নেড়ে বলছে ঠিক আছে কাল সকালে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে আসবো, তুমি মাল বেঁধে রেখো। গোকুল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, যা ভেবেছিল তা নয়। তবে হারাণ ব্যাটার চোখের চাউনি ওর ভালো লাগলো না, কেমন যেন, থলথলে ভুঁড়িটা নাচিয়ে গদগদ গলায় বলে— হি হি ঠিক আছে তুই এলেই মাল পাবি, তবে আমায় একটু দেখিস মাইরি। বড় শুকিয়ে যাচ্ছি।

কি গো কোথায় যাচ্ছ, দিনকে দিন চেহারাটা যে পোড়াকাট হয়ে যাচ্ছে। ভাড়া ফাড়া খাটো না—নাকি? গোকুল চম্পার দিকে তাকিয়ে বলে 'বাজার বড় কম্‌পিটিসনে, চকচকানিতে মানুষ ভোলে' চম্পার বুকটা একবার একটু দুলে

আবার নেমে যায়, মাঝ থেকে একটা শব্দ বার হয়। হুঁম্ ভা আজ কিছু হলো, যাক্ এই নাও দুটো টাকা, আজ আর নেই। শালা হারামী, বললাম পাঁচটা টাকা আগাম্ দাও তা বললে দুটো নিয়ে এখন যা, সন্ধ্যার পর দেখা করিস্, খালি ধান্ধা, আমিও শালী কাল সাগিনী, চম্পার চোখ দিয়ে যেনো একটা ঘৃণার ঝলকানী আকাশের দিকে ছুটে গেলো। পরমুহূর্তে সজল চোখে চেয়ে বলে— না খেয়ে তো আর গাড়ী চালানো যায় না, গায়ে ভাগোদ লাগে, নইলে গাড়ী ছোটাবে কেমন করে গোকুলদা। টিকির টিকির করে গাড়ী চললে লোকে উঠবে কেন, বাবুরা সবাই ব্যস্ত, কে কার আগে যাবে!

গোকুলের দম্ আটকে আসতে চাইলো, ইচ্ছা হোল গলা চিড়ে কিছু কথা বের করে তাতে যদি রক্ত ওঠে তো উঠুক। কিন্তু গোকুল কিছুই বলতে পারল না, কোনরকমে মুখটা নীচু করে হাত বাড়িয়ে টাকা দুটো নিয়ে সোজা ডেরায় চলে এলো।

ওর ঘরের সামনের আমলকি গাছটা কত ছোট অবস্থায় ওর বাবা এনে পুঁতে ছিল, তখন ওটাকে কেউ গাছ বলতো না বলতো আমলকি চারা। বাবা মারা যাবার পর গোকুল ওটার গোড়ায় জল দিত আগাছা সাফ করতো আর দেখতে দেখতে গাছটা বেড়ে উঠতে লাগলো, ওর বৃদ্ধির পরিমাপটা গোকুল কোনদিন টের পায়নি, চম্পাও ওর মনের মধ্যে বাড়তে বাড়তে কত বড়ো হোল ঠিক আমলকি গাছটার মত। ঘরের একদিকের চাল নেই গাছটার ডাল পালা সেই দিকটাকে ঢেকে রেখেছে। ভাড়ার অভাবে ট্যাঁকে একটাও পয়সা নেই।

চম্পাও আজ দুটো টাকা দিয়েছে। টাকা দুটো হাতের মুঠোয় নিয়ে গোকুল শুয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখল ওর সারা গায়ে রোদ ঝলমল করছে, বেলা প্রায় নটা কি দশটা।

আড়মোড়া ভেঙে গোকুল সামনের দোকান থেকে চা আর একটা রুটি খেয়ে ওর ভাঙা গাড়ীটার প্যাডেলে চাপ দিয়ে সিটে বসে ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চলে, আজ যদি চম্পার সাথে দেখা হয় তো বলবে—

'গোকুল' সান্টার ডাকে পিছন ফিরে চায়। সান্টা বলে ষ্টেশনের দিকে যাস না, ভীষণ গণ্ডগোল, চাল ধরার পুলিস, গুলি চালিয়েছে, দুজন মারা গেছে। রিক্সাটা সান্টার জিম্মায় রেখে পায়ে হেঁটে এগোয় ষ্টেশনের দিকে। দূর থেকে দেখলো কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে লোকে লোকারণ্য, গোকুল ভীড় ঠেলে একজনের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আঁৎকে ওঠে, একি চম্পা না, হ্যাঁ, চম্পাই তো

ওখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা গুলি ওর পিঠ ফুটো করে পরনের শাড়ীটাকে রক্তে ছাপিয়ে দিচ্ছে।

গোকুলের চোখ থেকে কি যেন ঝরে পড়লো, জল না আগুন ঠিক বোঝা গেল না। মুখ তুলে সূর্যটাকে দেখতে গিয়ে দেখল কৃষ্ণচূড়া গাছটার শুকনো ডালে একটা শকুন বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

Space donated by :

KALURAM MAHADEO PRASAD

1A, BURMAN STREET, CALCUTTA-7

Phone : 34-7606 (3 lines)

Makers of KMP Brand Edible oil and Industrial oil.

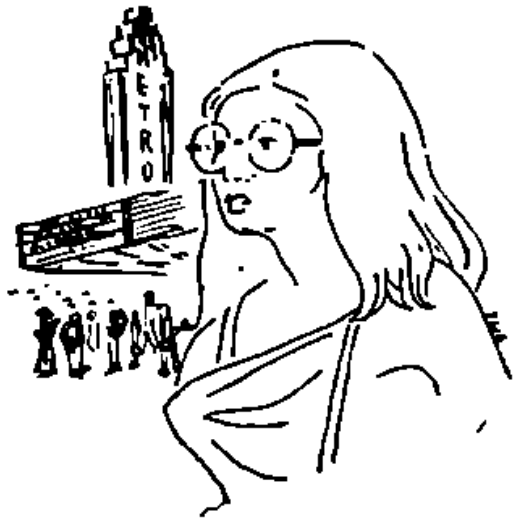

টেক্কা

তৃপ্তি বসু

মহিলাটি হাত দেখালেন।

হাত দেখালেই যে থামতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবু মন-মেজাজ আজ ভালই ছিল। রয় এ্যাণ্ড রয়-এর কনট্র্যাক্টটা হাতে এসেছে আর, এখন, এত রাতে এই যে বুড়ী শান্তা শক্সেনাকে তা'র পার্ক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, ছোট হলেও, সেও আর এক দাঁও। পথের দিকে চোখ রেখে মনে মনে হাসতে হাসতে ভাবছিল, কত পথের কথাই ত শোনা যায়। সৎপথ! শুভপথ! আজ আছে নাকি কোথাও তেমন পথের দিশা? ছেলেবেলায় যে ধনীর বাড়ীতে আশ্রয় মিলেছিল তার, সে বাড়ীর সমবয়সী মূর্খ ছেলেটা প্রায়ই তা'কে একটা মোক্ষম কথা শোনাত। বলত, ঘাড় গুঁজে পড়ে পড়ে মাথার বারটা বাজিয়ে বছর বছর প্রথম হয়ে কি হয়? অযথা সময় নষ্ট। আসল কথা হল টাকা আর টাকা মানেই টেক্কা। এক্কেবারে মেরে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া।

…তা ঠিক। আসল কথা শুধু টাকাই নয় ওই মেরে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। মারতে না পারলে তোমাকেই মরতে হবে। আর ওই মারার কায়দা দীর্ঘদিনের অনলস সাধনায় সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে বলেই না আজ সুবীর প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। আজকের কনট্র্যাক্টার কথাই ধরা যাক্। টেণ্ডার এ্যাপ্রুভারকে কড়া হাতে মোটা রকম খাওয়াতে পেরেছে বলেই না আর পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে! সোজাসুজি এলে হত

নাকি কিছু? প্রথম জীবনে অনেক উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়েছে। সুযোগ পেলে আজও যে করে না তা' নয়। বুড়ী শান্তা শকসেনার পেছনে আজ একবছর ধরে লেগে রয়েছে সুবীর। আজ ছিল পে-ডে। এইসব দিনে সন্ধ্যার দিকে বুড়ীর শোক উথলে ওঠে তার মরে যাওয়া স্বামী আর তিরিশ বছর আগে শেষ নিঃশ্বাস ফেলা ছ' মাসের ছোট বাচ্চাটার জন্যে। শোক ভুলতে বুড়ী 'বার'-এ গিয়ে বসে। আর গত একবছর ধরে এ সময় সুবীর নিয়মিত সঙ্গ দিয়ে আসছে বুড়ীকে। সঙ্গ দেয়, কথা বলে, বুড়ীর অতীত জীবনের বহুবার শুনে শুনে পচে যাওয়া পুরণো কাহিনী মনোযোগ দিয়ে নতুন করে শোনার ভাণ করে আর বুড়ীর টাকার হুইস্কি গেলে। নিজে সে সহজে হারায় না নিজেকে কিন্তু যেদিনগুলোয় মিসেস শান্তা বে-সামাল হয় সেইসব দিনগুলোই সুবীরের উজ্জ্বল দিন। যেমন আজ। এইমাত্র তাকে তা'র ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসছে···তা'র টাকায় ভরা পেটমোটা পার্সটা এখন সুবীরের কোটের সাইড পকেটে। কাল দিনের বেলা সুস্থ হওয়ার পর একটু খোঁজ-খবর করবে বুড়ী, খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করবে, তারপর শান্ত হবে। ওতে ওর কিছু যায় আসে না। চাকরী ওর শখের। বিধবা বুড়ীর অনেক টাকা আর তারই সৌরভ টেনে এনেছে সুবীরকে। আসলে বড়লোকের সেই মূর্খ ছেলেটাই জীবনের সার কথা বুঝেছিল। টেক্কা, টেক্কা শুধুই টেক্কা। টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়া।···এমন সময় হাত দেখালেন মহিলা।

···একটা সদ্য খোঁড়া গর্তকে সাবধানে পাশ কাটাতে কাটাতে সুবীর জানতে চাইল—কোন দিকে যাবেন?

—আপনি যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকেই।

দু' একবার আড়ে আড়ে চেয়ে মহিলাটিকে সার্ভে করে নেওয়ার চেষ্টাটা সফল হল না আলো-আঁধারিতে। একটা স্ট্রীট লাইট পার হতেই মহিলাই হঠাৎ বলে উঠলেন—সুবীর না।

এ্যাক্সিলেটার থেকে আস্তে পা সরিয়ে গাড়ীর গতি কমিয়ে এনে একটু অবাক হয়েই ফিরে তাকাল সুবীর। মুখের ওপর দু'চোখ মেলে খুঁজতে লাগল পরিচিত ছায়া।

মৃদু হাসলেন মহিলা—চিনতে পারলে না?

বিদ্যুৎ ঝলসাল বিস্মৃতির অন্ধকারে। ললিতা!

আশ্চর্য, সর্ব অবয়বে স্পষ্ট হয়ে পাশে বসে রয়েছে যে নারী এতকাল পরে

তাকে আর কিছুতেই চেনা গেল না, চেনা গেল শুধু ঠোঁটের কোণের সূক্ষ্ম হাসিটিতে! পথ চলতে কত বিভিন্ন জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কারও শরীরের বিশেষ গঠন, কথা বলার ভংগী, হাসির লহরী মনে পড়িয়ে দেয় অন্য কাউকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থানে-অস্থানে কত মেয়ের সঙ্গেই ত চেনা হল, কত মেয়েই এল কাছাকাছি তবু কই কারো হাসির রেখাই ত কখনো মনে পড়িয়ে দেয় নি এই ললিতাকে? এ বুঝি এরই নিজস্ব। ললিতা তার কৈশোর সহচরী না সহচরী, বললে ভুল হবে। স্বপ্ন-সহচরী। সেই ধনী আশ্রয়দাতার সুদুর্লভা কন্যা।

…হঠাৎ খেয়াল হল। এত রাতে ললিতা এ সময় একা এখানে কেন?

—কোথায় এসেছিলে?

—বন্ধুর বাড়ী। অফিসের এক ক্রীশ্চান বন্ধু। তা'র ছেলের অন্নদিন ছিল আজ।

—অফিসে কাজ কর নাকি?—সুবীর অবাক হল।

—হ্যাঁ।

—কোন্ অফিস?

—নামকরা কিছু নয়, নাম শুনে আর কি হবে।

—তবু?

একটু অপেক্ষা করে জবাব না পেয়ে আবার বলল—মেসোমশায় কেমন আছেন?

নেই।

নেই?…তা' কেই বা আর চিরকাল থাকে?

বলেই মনে হল বড় নীরস হয়ে গেল কথাটা। স্বরে বুঝি আর এক টু উত্তাপ মেশানো উচিত ছিল। হাজার হোক এক কালের উপকারীজনের মৃত্যুর সংবাদ ত!…

মাসীমা?

ভাল।

আর আর সবাই?…কি যেন ছিল সব নামগুলো?…

একটু যেন ব্যস্ত ভাবেই ললিতা বলে ওঠে, আছে আছে সবাই ঠিক আছে শুধু বাবা নেই, দাদা এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, ছোট্টটা সামান্য একটা চাকরী পেয়েছে লিলুয়া ওয়ার্কসপে মা আর বাকী দু'টোর তদারকী করি আমি…বাবা

মারা যাবার পর দেখা গেল শূন্য সিন্দুকটা যেমন আমাদের কোনও কাজে লাগল না তেমনি অতবড় বাড়ীখানাও আমাদের ভারসহ নয়। আগেই বন্ধক রয়েছে। ···এইত গেল আমাদের কথা, এবার তোমার কথা বল। কি করছ? বিয়ে করেছ?

হাসল সুবীর। কিছু করা আর বিয়ে করা এক হল?

না, তা ঠিক নয়···তবু···

করছি রোজগার। আর দ্বিতীয়টাও করে ফেলা গেছে।

এতক্ষণ কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে ছিল ললিতা। এবার এগিয়ে এসে একেবারে গায়ে গা মিলিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, রোজগার যে করছ আর ভালরকমই করছ সেত এক নজরেই বোঝা যায়।···তোমায় কিন্তু আরও দু'দিন দেখেছি আমি।

দেখেছ? কোথায়? ডাকনি কেন?

ডাকব কি করে? দূর থেকে ঠিকমত বুঝতে পারিনিত। শুধু চেনা চেনা লেগেছে। দেখেছি শান্তা মেমের ফ্ল্যাটের করিডরে। ওর ঠিক উল্টোদিকের ঘরখানাই ত আমার বন্ধুর।

'শান্তা মেম!'

চমকে উঠল সুবীর। আস্তে কনুই ছোঁয়াল বাঁ দিকের সাইড্ পকেটে। না, ঠিকই আছে। পেটমোটা পার্সটা ঠিকই রয়েছে সেখানে। কিন্তু···শান্তা মেম! একেবারে অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন করে বসল—

যে বান্ধবীর ছেলের জন্মদিনে গেছলে তার স্বামী আছে?

—আছে। কেন? বিস্মিত হল ললিতা।

—থাকলে এই অসময়ে তুমি একা একা কেন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলে ট্যাক্সির জন্যে?

একটু চুপ করে থাকল ললিতা। তারপর জবাব দিল—তা' সবসময় কি আর এগিয়ে দেওয়া চলে? অসুবিধাও ত থাকে মানুষের।

তা' থাকে। তবে এটা হল ভদ্রতা, কার্টসি। তা' ছাড়া পরিবেশটাও যে কোনও ভদ্রমহিলার একা একা দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক। আর এভাবে দাঁড়িও না।

আচমকা একটু উষ্ণ স্বরেই ললিতা বলে বসল—

দয়া করে লিফ্ট দিচ্ছ বলে তুমি কি উপদেশ দেওয়া শুরু করলে নাকি?

তা' যদি হয় তাহ'লে নামিয়ে দাও। এখানেই নেমে যাব আমি। উপদেশ শোনার বয়স বা অভ্যাস কোনটাই আমার নেই।

পাগল। তোমায় কি উপদেশ দিতে পারি? চিরকালই ত তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

আবার চুপচাপ।

কিন্তু 'শান্তা মেম' এই দু'টো শব্দ কিছুতেই ভুলতে পারছে না সুবীর। কি করে জানা যায়·· কি করে জানা যায় কে সত্যি বলছে! সেই যে তখন থেকে গা ঘেঁষে বসে আছে ললিতা, বসেই আছে একভাবে। মাঝে মাঝেই তা'র দেহের ঘন স্পর্শ পাচ্ছে। শরীরের অস্পষ্ট গন্ধ, শ্যাম্পু করা চুলের হালকা সৌরভ। চেতনায় জোয়ারের সাড়া তুলছে।

তবু—

বন্ধুর বাড়ীতে কখন এসেছ? সকালে?

বুঝি অন্যমনস্ক ছিল ললিতা। ভাবছিল কিছু। জবাব দিল, বিকেল বেলা এলাম এই প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়।

কিসে এলে?

কেন? বাসে।

এইবার পরিতৃপ্তির হাসি হাসল সুবীর। এতক্ষণে যেন ধরতে ছুঁতে পারা যাচ্ছে। শান্তাবুড়ী মদের ঝোঁকে যাই বলুক কথাগুলো বোধহয় মিথ্যে নয়। নিঃশব্দে হাসতে লাগল সে। হাসি দেখে চকিত হল ললিতা। একটু বুঝি বিব্রতও। এত সাবধানে এত গুছিয়ে কথা বলছে তবু কি ভুল হয়ে গেল কোথাও? একটু ইতস্ততঃ করে জানতে চাইল—হাসছ কেন?

হাসব না? এমন মজার কথা শুনলে কার না হাসি পায়? কন্‌ডাক্টার পেটানর প্রতিবাদে আজ দুপুর থেকে সব রুটেই বাস বন্ধ আর তুমি কিনা 'প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়' সময়ে বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে এলে সেই বাসে চড়েই?

একেবারে চুপ হয়ে গেল ললিতা। একটু পরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বোধহয় এমন সময় বাঁ হাতে ললিতার কোমর জড়িয়ে আরও কাছে-টানার চেষ্টা করল সুবীর। দুর্লভা আজ সুলভা হয়েছে। আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে ধূলার ধরণীতে।

ছাড়—ছাড় বলছি···অসভ্য কোথাকার!

অসভ্য! তা শান্তা মেমের ঠিক উল্টোদিকের ঘরে কোন্ সভ্যতার নাটকের

অভিনয় করে এলে এতক্ষণ ?……মদের ঝোঁকে বুড়ী সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিল বটে যে এ আর এখন আমায় কি দেখছ ? এখন ত শুধু রং টুকুই। আর ত মোটা হয়ে গেছি, বয়সও হয়েছে, চুলও প্রায় সাদাই হয়ে এল সবগুলো। আমার ঠিক সামনের ফ্লাটা যে ছুঁড়ী মাস তাড়ায় রেখেছে, সন্ধ্যের দিকে কোথা থেকে যেন এসে ঘণ্টা হিসেবে লোক ধরে, সে ছুঁড়ীটা আমায় ডাকে 'শান্তা-মেম।' সে বলে এই বয়সেও তোমার যা রং তা'তে তোমার মেমসাহেব নামটাই মানানসই হত। তা……এবার জোর করেই সুবীর ললিতার মুখটা নিজের মুখের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করে।

জোরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে সরে যায় ললিতা।

থামাও, থামাও বলছি গাড়ী—নইলে চেঁচাব আমি……ইতর কোথাকার!

দক্ষ-হাতে স্টিয়ারিংটাকে কায়দা করে উত্তেজিত সুবীরও বলল, চেঁচাবে ? না ? আর এতক্ষণ যে আমার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে ঘন হয়ে বসেছিলে ? তখন ? তখন কি হচ্ছিল ?

জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ললিতা হাঁক দিল—পুলিশ! পুলিশ! রাস্তার পাশ ঘেঁষে গাড়ী থামাল সুবীর। হঠাৎ ঝুকে পড়ে প্রচণ্ড জোরে ললিতার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—এক্ষুনি নেমে যাও। পুলিশ এসে পড়লে তোমার নিজেরও বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

নেমে গেল ললিতা। রাগে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মনে মনে গজরাতে লাগল সুবীর। উচিত ছিল মেয়েছেলেটাকে চলন্ত গাড়ী থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। পুলিশ! পুলিশ দেখাচ্ছে সুবীর সেনকে ? নেহাৎ কিছুটা অসুবিধা আছে তাই নইলে……

…উত্তেজনা অনেকখানি কমে এসেছে। মাথাটাও ঠাণ্ডা। বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছে আর এতক্ষণে……এতক্ষণে মনে পড়ল কথাটা। …চমকে উঠল পাশ পকেটে হাত দিয়েই……পার্স ? শান্তা শক্সেনার পেটমোটা পার্সটা ?……বাঁ দিকের হিপ্ পকেটে তা'র নিজেরও ত অনেকগুলো টাকা ছিল…তাও ত…সাফাই! নিখুঁত হাত সাফাই। তাই, তাই অত গা ঘেঁষে বসা! অত অভিনয়! যে মুহূর্তে পার্সটা হাতিয়েছে সেই মুহূর্তেই বোধহয় প্রথম রাগের ভাণ করে নেমে যেতে চেয়েছিল। তারপর সুবীরের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় হাতিয়েছে তার টাকাগুলো। …কি করা যায়… কোথায় ধরা যায় ওকে ? শান্তা বুড়ীর ফ্ল্যাটে গেলে…না এখন বেশ

কয়েকদিন আর ও মুখোই হবে না। সে জানে যে সুবীর তা'র ও ঠিকানা জেনে গেছে। তাহ'লে…

…মৃদুহাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। গেম্ ইটস্ আগেম্। পথ দীর্ঘ। এ পথে শেষ পর্যন্ত কে কাকে টেক্কা দেবে, মেরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে সেইটেই বড় কথা। হারজিত কিছু নয়। আজকের পরাজয় কালকের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। নিশ্চিত জয়ের নিশানা। অতএব…লা…লা…লা…লা…আই মেট্ আ গার্ল ইয়ে… স্…টা— ডে এ…এ আই…স…হা…ইন্ এ…লে…এ… এ…এন……।

Phone No. : 35-3782

69, BASU PROCESS & ART CO.

PROCESS BLOCK, DESIGNER & PRINTERS

I/IA, Baishnob Sammiloni Lane,
CALCUTTA-6

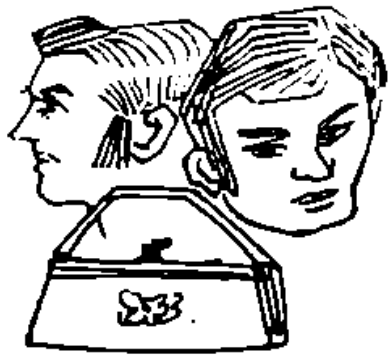

প্রিয় সুনীল ও লেডিস ব্যাগ

বিপুলকুমার সেনগুপ্ত

লেডিস ব্যাগটা ট্যাক্সির ভেতর পাওয়া গেল। ট্যাক্সির সীটের পেছনে যে অপরিসর জায়গাটা থাকে ওখানে পড়েছিল ব্যাগটা। প্রথমে দেখেছিল সুনীল এবং সুনীলের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে প্রায় সংগে সংগে প্রিয়তোষও দেখেছিল।

এটা এক রকমের আবিষ্কার বলা চলে। প্রায়ই ওরা দুজনে এক সংগে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরে। বিবিডি বাগ থেকে ওরা দুজনে ওঠে, সুনীল কড়িয়াহাটায় নেমে একটা 'সাটল্' বাস ধরে বাড়ি চলে যায়। আর প্রিয়তোষ একদম বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায় ট্যাক্সিটা। অফিস ছুটির পর সোজাসুজি বেরিয়ে পড়লে আর ট্যাক্সির দরকার হয় না। যেদিন অফিসে ওভারটাইম থাকে বা বন্ধুদের সাথে দু'হাত তাস খেলতে খেলতে রাত হয়ে যায় তখন বাধ্য হয় ট্যাক্সি নিতে। ইদানিং ওদের একটু রাতই হয় বাড়ি ফিরতে, আর তাই ট্যাক্সিও নিতে বাধ্য হয় ওরা।

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে ওরা প্রায়ই ভাবে হঠাৎ যদি এক বাণ্ডিল টাকা পেয়ে যায় সীটের ওপর, বা মোটাসোটা একটা 'পার্স'! বিচিত্র কি এই কোলকাতায়! কত মালদার লোকই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্যাক্সি করে, ভুলে পড়ে থাকতেও তো পারে।

প্রিয়তোষ বলছিল, বুঝলি সুনীল আজকাল ট্যাক্সিতে ঘোরাফেরা করে যত কোতোকাণ্ডনেরা নয়তো আমাদের মত কেপ্‌লুরা। নইলে এতদিন কোলকাতায় চরাফেরা করলুম ট্যাক্সিতে একটা সেফ্‌টিপিন পর্যন্ত কুড়িয়ে পেলাম না।

তাই যখন ট্যাক্সিতে বসতে না বসতেই পেছন দিকে লেডিস ব্যাগটা হঠাৎ দেখতে পেল, সুনীল তখনও বিস্মিত হতচকিত। সুনীলের বিস্মিত নয়নের দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ ব্যাপারটা বুঝল এবং উৎফুল্ল হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুনীল ওকে চোখ টিপে থামিয়ে দিলো।

সামনে পাঞ্জাবী ড্রাইভার একা। মেয়ো রোড দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে কিড ষ্ট্রীট-এর দিকে। তখন রাত প্রায় দশটা। তবুও গাড়ির বেশ ভীড় ছিল। ড্রাইভার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

সুনীল আর প্রিয়তোষ উসখুস করছিল ব্যাগটাকে ড্রাইভারের নজর এড়িয়ে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিতে। সুনীলের হাতে ছিল একটা সাপ্তাহিক কাগজ আর নিজের মোটা ডায়েরীটা। সুনীল টপ করে হাতের জিনিসগুটো পেছনে তুলে রেখেদিল যেখানে ব্যাগটা ছিল। বইতে ঢাকা পড়ে গেল ব্যাগটা। যাক নিশ্চিন্ত! ধীরে সুস্থে নামবার সময় নিয়ে নামলেই হল। খবরের কাগজে কার্ট প্রাইজ পাওয়া টিকিটের নম্বরের সাথে সুনীল বা প্রিয়তোষের টিকিটের নম্বর যেন মিলে গেছে। পরে এক সময় গিয়ে টাকাটা তুলে আনলেই হ'ল।

প্রথম নজরেই ব্যাগটা দেখে নিয়েছিল সুনীল। বেতের বুনোট, বেশ বড় আকারের ভ্যানিটি ব্যাগ। বর্ডার দেওয়া চারপাশ। রংটা খেয়াল করেনি, কালো বা নীল হতে পারে।

চুলোয় যাক রং। ব্যাগের ভেতরটা না দেখতে পারলে স্বস্তি নেই। সিগারেট চাইলো। প্যাকেট-টা বাড়িয়ে দিল প্রিয়তোষ। দেশলাই জ্বালল। অভাবিত ব্যাপারটায় প্রিয়তোষ খুক খুক হাসছে। সিগারেট মুখ দিয়ে দুজনেই একটু অন্যমনস্ক হতে চাইল। কিন্তু হতে পারছিল না। ব্যাগটা নেড়ে চেড়ে না দেখতে পারলে স্বস্তি নেই। কি না-কি ভেতরে আছে। সুনীল ভাবল ব্যাগটা নামিয়ে এনে দেখে কিন্তু ভরসা পেলনা। ওর মনে হ'ল ড্রাইভার বুঝি সামনের আয়না দিয়ে সব দেখতে পাবে। দেখতে পেলে কি কেলেঙ্কারী। জিজ্ঞাসাবাদ করবে, প্রমাণ চাইবে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে না পারলে ভীড় জমাবে, তারপর একটা 'সীন' তৈরী করবে। তার থেকে থাক বাবা, ওটা ওখানেই শুয়ে। নামবার সময় দেখা যাবে।

প্রিয়তোষ একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে আর মাঝে মাঝে কনুই দিয়ে ঠেলা মারছে সুনীলকে। অর্থাৎ ব্যাগটা খুলে দেখলে হয়। ওকে ইশারা করল, সুনীল এখন চুপচাপ থাক।

সুনীলের হঠাৎ মনে হল আচ্ছা বোমাটোমা নেই তো ব্যাগটার মধ্যে! আজকের দিনে থাকাতে বিচিত্র নয়। অভিসন্ধি করেও কেউ ফেলে রাখতে পারে। কোন একটা ইংরেজী ছবিতে এমনি একটা দৃশ্য ছিল। জাহাজ ছাড়বার আগে জাহাজ ঘাটায় পৌঁছতে হবে নায়িকাকে। একটা ট্যাক্সির খুব দরকার। হঠাৎ সামনে একটা ট্যাক্সি এসে হাজির, ভিলেনের কারসাজিতে। আজকেরই মত একটা ছোট ব্যাগ পড়েছিল ট্যাক্সিতে। যেই না ধরা……উফ্! সুনীল আঁতকে উঠল ছবিটার কথা মনে করে।

: তোর মনে আছে প্রিয় টাইগারের সেই ছবিটার কথা? অনিতা একবার আর সেই হীরোটা ছিল, অনেকটা রিপ কার্বির মত দেখতে।

প্রিয়তোষ অনেকক্ষণ চুপচাপ। জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। সুনীলের মনে হল ওর কথা কানে নেয়নি প্রিয়তোষ। কিন্তু প্রিয়তোষ ঠিকই শুনেছিল।

: হ্যাঁ আমারও মনে পড়ছে ছবিটার কথা। ব্লাকে টিকিট নিয়ে তুই, আমি আর ও গিয়েছিলাম।

ও এখানে সুনন্দা। প্রিয়তোষের পরিচিতা। ওর সঙ্গে বিয়ে হত কিন্তু হচ্ছে না। দ্বিতীয় নায়কের প্রবেশ ঘটায়। খুব সলভেন্ট পার্টি। কোন এক টায়ার কোম্পানীর সেলস্ একজিকিউটিভ। প্রিয়তোষের পরের কথাটায় বোঝা গেল ওর চিন্তাস্রোত কোন খাতে বইছে।

: আচ্ছা সুনীল, নীহার বা নীহারের কোন লোক আমাদের ফলো করছে না তোর, নইলে দেখ অতদিন ট্যাকসির জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর আজকে কেমন গায়ের ওপর নিজে এসে ট্যাকসিটা দাঁড়াল।

সুনীলের কেমন হাসি পেল, ব্যাগটা আবিষ্কারের পেছনে নীহারকে টেনে আনায়। নীহার হচ্ছে দ্বিতীয় নায়ক।

: প্রেমে পড়লে যে সত্যি সত্যি বোকা হয়, তোর কথায় আবার প্রমাণ পাওয়া গেল। তুই কি করে ভাবতে পারলি যে নীহার তোর পেছনে লেগে আছে। আশ্চর্য! নীহারের সেই গার্টস্-ই নেই। নীহারকে আমি যতটুকু চিনি তাতে এই বুঝি সামাজিক প্রতিপত্তি পাবার জন্য একজন সুন্দরী সপ্রতিভ মহিলার প্রয়োজন ওর মাঝে মাঝে। ওই মাঝে মাঝের প্রয়োজন মেটাতে নীহারের প্রয়োজন সুনন্দাকে। আচ্ছা, তোর কি মনে হয় সুনন্দা নীহারকে ভালবাসে? বিয়ে করতে পারে?

প্রিয়তোষ পুরোনো সিগারেট থেকে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলল, অসম্ভব কি! আমার মনে হয় ওই রাস্তাতেই ওরা এগোচ্ছে। নইলে গত রোববার আমার সঙ্গে এপয়ন্টমেন্ট করেছিল গড়িয়াহাটের কাছে, দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, এল না। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলুম হঠাৎ দেখি 'আলেয়া' সিনেমা হলের সামনে যে রেষ্টুরেন্টটা রয়েছে সেই 'ফ্যান্টাসি' থেকে বেরুচ্ছে দুজনে। সুতরাং বুঝলে গুরু, ব্যাগের ভেতর বোমা ও রাখুক আর নাই রাখুক, আমাকেই রাখতে হবে একদিন।

: আচ্ছা ঠিক আছে। সুনন্দাকে পেলে তো আর ওইসব রাখতে হবে না, এখন চুপ কর। এই বলে ড্রাইভারের দিকে ইশারা করে চোখ টিপল সুনীল। গাড়িতে বসে আলোচনা, এই আলোচনায় বোমা থাকা উচিত নয়।

গাড়ি গুরু সদয় রোড ছেড়ে ডান দিকে বাঁক নিল। হেড লাইটের আলোয় বাসষ্টাণ্ডে এক পলক দারুণ একটা ছবি দেখা গেল। ফর এ্যাডাল্টস্ ওনলি। সুনীলের ইচ্ছে হচ্ছিল মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সিটি মেরে দেয়।

ছবিটা এক পলকের হলেও প্রিয়তোষও দেখেছিল। ও বলল, বেশ আছে মাইরি লোকগুলো। খোঁজ নিয়ে দেখ ঘরে লোকটার বিয়ে করা বৌ আছে। খাবার ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে হয়তো স্বামীর জন্য। বৌটি হয়ত জানে স্বামী অফিসে ওভারটাইম নয়তো শখের থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছেন। কিন্তু এদিকে যে স্বামী দেবতাটি রাত সাড়ে দশটায় নির্জন বাসষ্টাণ্ডে নিজেকে 'পাটি সাপটা' করে তুলেছেন, বুঝলি সুনীল, এ হচ্ছে ঠিক গাছেরও খাব তলারও কুড়োবো।

বেশ একটা লাগসই উপমা দিতে পেরেছে ভেবে প্রিয়তোষ বেশ জোরে জোরে হেসে উঠল।

: বুঝলি প্রিয়, সারাদিন আমার মেয়েদের কথা মনে পড়ে না, কিন্তু রাত্রে যখন নিজের হাতে বিছানা করতে হয়, বিশেষ করে মশারী খাটাতে হয়, তখন খুব মনে হয় ওই ধরণের একটা কেউ থাকলে মন্দ হত না। টান টান করে বিছানা পেতে, মশারীর চার কোনা টান টান করে বেঁধে দেবে……

: খালি বিছানা পেতে দেবে? তাহলে একটা কাজ কর না, বিজ্ঞাপন দে—বিছানা পাতিতে অভিজ্ঞা পাত্রীর প্রয়োজন……প্রিয়তোষ কথাটা শেষ না করেই হেসে উঠল।

গাড়ি গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রিয়তোষ আগে নেমে

ড্রাইভারকে টাকা দিতে গেল। সুনীল বাঁধা ছকে বই কাগজ জড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল।

অতঃপর? প্রিয়তোষ তাকাল সুনীলের দিকে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। গড়িয়াহাটায় এখনো বেশ লোকজন রয়েছে। 'সাটল্' বাসের লম্বা লাইন পড়েছে। বুক ষ্টলের ছেলেটি বইগুলো গুছিয়ে তোলার আয়োজন করছে।

ফোঁটা ফোঁটা কালি পড়ার আলোর বিজ্ঞাপনটা অর্ধেক বিকল হয়ে জ্বলছে। সুনীল এক ঝলক এই সব দেখে নিল। তারপর কি ভেবে প্রিয়তোষকে বলল, আয় আমার সংগে।

রাস্তা পার হয়ে এল দুজনে। 'সাটল্' বাস ধরার জন্য লাইনটা আরো লম্বা হয়ে গেছে এর মধ্যে। সুনীল ভাবল ওর চেনাজানা লোক ওই লাইনে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে। বাসগুমটিতে জিজ্ঞাসা করল কটা নাগাদ 'সাটল' বাসটা আশা করা যায়। যেন এই খবরটা নেওয়াই সুনীলের এখন জরুরী কাজ। তারপর হঠাৎ-ই পাবলিক কল বুথ-এ ঢুকে পড়ল। সংগে সংগে প্রিয়তোষও।

প্রিয়তোষ সুনীলের মুখের দিকে তাকাল; সুনীল প্রিয়তোষের মুখের দিকে। আর এক রান করলেই জেতা যায়। এখন উইনিং ষ্ট্রোকটা দেবে কে?

সুনীলের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে প্রিয়তোষ খুলে ফেলল। ভেতর থেকে বার হ'ল একটা জেন্টস মানিব্যাগ ছোট্ট লেডিস ব্যাগ আর সাদা এক টুকরো কাপড় তাতে বাঁধা কিছু একটা। জেন্টস মানিব্যাগটা খুলে দেখল গোটা আটেক টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। ব্যাগখানা খুব জমকালো। চেন দিয়ে তিনদিক মোড়া, নানারকম পকেট রয়েছে ভেতরে। লেডিস ব্যাগটায় খুচরো আর টাকায় মিলিয়ে ছিল গোটা তেরো টাকা। দুটো ব্যাগই তো দেখা হ'ল। আর বাকি রইল ওই কাপড়ের টুকরোটা। খোলা হ'ল। সুপুরী মৌরী আর লবংগ বাঁধা রয়েছে ওই কাপড়ের টুকরোয়।

ব্যাস, খেল শেষ! সুনীল ভাবল হিচকক-সাসপেন্সের যবনিকা পতন হল। প্রিয়তোষ ভাবল অন্যরকম। দৌড় শেষ করে ঘোড়াগুলো ষ্টাব্‌লে ফিরে যাচ্ছে আর নিজে মাঠের ছেঁড়া টিকিটগুলোর মধ্যে নিজের টিকিটটা ছিঁড়ে ধীরে ধীরে টেন্ডিয়াম থেকে নেমে আসছে।

'বুথ' থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। প্রিয়তোষের পকেটে ছিল জেন্টস মানিব্যাগটা আর ছোট ব্যাগটা ছিল সুনীলের কাছে। ভ্যানিটি ব্যাগটা প্রিয়তোষ নিতে চাইল না, বাধ্য হয়ে সুনীল রেখে দিল নিজের কাছে।

প্রিয়তোষ ব্যাগটা নিলনা সুনন্দার কথা মনে করে, আর সুনীল ব্যাগটা নিল, নন্দা ছন্দা বা কোন সন্ধ্যার কল্পিত মুখ মনে করে।

দুজনেই একটু বিমর্ষভাবে বেরিয়ে এল 'বুথ' থেকে। যেন কিছু হারিয়ে গেছে ওদের। প্রিয়তোষ একটা সিগারেট ধরাল। বলল, রাত খুব বেশি হয়নিরে, চল একটু চা খাওয়া যাক। চল, সুনীল প্রিয়তোষের সংগে রাস্তা পার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বাস এসে কিছু লোক কমিয়ে দিয়ে গেছে লাইনের। গুটিকয়েক মেয়েও দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য। চলতি পথে প্রত্যেকটি মেয়ের মুখগুলো দেখে নিল একবার সুনীল। একটাও চেনা মুখ নেই। থাকলে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে একটা লিফট্ দিতে পারত আজ। ট্যাক্সির ভাড়াটা যখন মুফতে জুটে গেল তখন আজ আর বাস নয়।

দোকান প্রায় খালি। মালিক নিজেই চেয়ারগুলো উল্টে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছে। তবু দোকানের কোণের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল প্রিয়তোষ। সুনীল লেডিস ব্যাগটা টেবিলের ওপর ফেলে রাখল। ওটা কেউ নিয়ে নিলেও ক্ষতি নেই, আবার থাকলেও ক্ষতি নেই।

পুরোনো সিগারেটটা থেকে আর একটা নতুন সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে প্রিয়তোষ বলল, ওই জেন্টস ব্যাগটা ওই মেয়েলি ব্যাগটার মধ্যে কেন ঢোকানো বলত? এটা নিশ্চয়ই লাইনের ব্যাপার। পরে যদি টাকা পয়সা না দেয় তাই আগে থেকে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে। আর তেমনি মদ্দাটাও ভেকুয়া।

: তুই না জেনে শুনেই ভদ্রলোককে একদম ভেকুয়া বানিয়ে দিলি। এমনতো হতে পারে ওরা স্বামী-স্ত্রী। পকেটমার হয়ে যাবার ভয়ে ওই ব্যাগে রেখেছে।

: ট্যাক্সিতে পকেটমার?

: বাসেই হয়তো যাওয়া আসা করেন। রোজকার অভ্যেস মত দিয়ে রেখে ছিলেন নিজের স্ত্রীর কাছে।

: তুই থামতো। এ একেবারে লাইনের ব্যাপার। তবে পুরোপুরি ওস্তাদ নয়, ট্রামে বাসে উঠলে হয়তো এখনো গা-টা গোলায় তাই ওই মৌরীর বন্দোবস্ত।

: আমার কিন্তু ওই সুপুরী-মৌরীর পুটুলিটা দেখে আরো সন্দেহ হয় ওরা স্বামী-স্ত্রী। বছর খানেক হয়তো বিয়ে হয়েছে, এখন গা-ঢা গোলাবার স্টেজ চলেছে।

দুজনকে দুটো কেক দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল দুজনের। পুরো একগ্লাস জল খাওয়ার পর লোকটি গ্লাস নিয়ে চলে যাচ্ছিল ধুয়ে রেখে দেবে। প্রিয়তোষের খাওয়া গ্লাসটায় জল ঢেলে ধুচ্ছিল লোকটি কিন্তু প্রিয়তোষ আবার হঠাৎ জল চাইল; তেষ্টা পুরো মেটেনি। লোকটি জলটা না ফেলে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল প্রিয়তোষের দিকে। প্রিয়তোষ ওই জল খেল না। নতুন করে জল দিতে বলল।

: তুই খেলি না কেন। তোরই খাওয়া গ্লাসে তো জল দিয়েছে?

: তুই খেতিস?

: না।

: না কেন?

: কেমন যেন ঘেন্না করে। কিন্তু কেন যে করে এর কোন যুক্তি নেই।

: যেমন যুক্তি নেই—প্রিয়তোষ কি যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, আচ্ছা বলত spiral staircase মানে কি? বল বল বল?

: কেন, ঘোড়ানো সিঁড়ি—এই বলে সুনীল নিজের ডান হাতের তর্জনীটা বার কয়েক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোরান ছবিটা বোঝাল।

: মুখেও বললি আবার হাত দিয়ে ছবিও আঁকলি কেন? শুধু তুইনা, দেখবি সবাই মুখেও বলবে আবার আঙুল নেড়ে নেড়েও বোঝাবে। কেন যে নেড়ে বোঝায় বুঝি না। এ এক রহস্য।

: আজকের ঘটনাটাই দেখনা। লেডিস ব্যাগটা পেয়ে আমাদের কি কিছু লাভ হ'ল? বরঞ্চ আমাদের লোকসান হল। আমরা দুজনেই যেন পরস্পর পরস্পরের কাছে ছোট হয়ে গেলাম। তবে আমরা দুজনেই কি একে অন্যের কাছে ছোট হবার জন্য এই একটি ঘন্টা ধরে উৎকণ্ঠিত ছিলাম? কিরে?

প্রশ্ন

সুনীল বসু

অচেনা লাগছে, রাধাকে—শ্রীমতীরাধারাণী দত্ত C/o. কিংবা W/o শ্রীঅমিতাভ দত্ত। অচেনা লাগছে ভীষণ। মনে করতে পারা যাচ্ছে না কিছুতেই—পনেরো বছর এক সংগে এক ঘরে দিন রাত কাটিয়ে এক রান্নাঘর এক বাথরুমের অংশীদার হয়ে একটি একটি করে তিনটি সন্তানলাভের পরে—কখনো কলহ কদাচিৎ প্রণয় সম্ভাষণে কখনো কাছে কখনো দূরে থেকেও রাধা এখন সম্পূর্ণ অচেনা। ঐ থৈ থৈ মানুষের—মেয়ে পুরুষের অঢেল সমুদ্রের মধ্যে রাধাকে দেখা যায়—কিন্তু চেনা যায় না। চেহারাটা অস্পষ্ট—দৃষ্টি স্থির করলে নজরে পড়ে—সেই সিঁথি বরাবর কপালটা চওড়া—কপালের টিপটা দেখা যায় না—কিন্তু অনুমান করা যায়—প্রায় ছোঁয়াছুয়ি ভ্রূ দুটির ঠিক ওপরেই টিপটা—চুল টেনে বাঁধা—ঠোঁটের কোণে হাসিটা, ঠিক হাসি নয়; হাসবার প্রাক্‌মুহূর্তে ঠোঁটের কোণে যে বাঁকটা ধরা পড়ে সেই জাতীয় ঠোঁটের গঠন—সবই ঠিক আছে। দাঁড়িয়ে নেই বলে শরীরের ছাঁদটা দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু বেশ অনুমান করা যাচ্ছে শরীরের কোথায় কতটা মাংস কতটা হাড়—কোথায় জড়ুল—কোথায় তিল—সবই অনুমানের সীমানার মধ্যেই।

কিন্তু রাধাকে অচেনা লাগছে। ঐ উদ্বেল জনতায়, সোচ্চার দাবীর মধ্যে একটি কণ্ঠ যে রাধার তা স্পষ্ট না হলেও নিশ্চিত।

রাধাকে—পনেরো বছর এক ঘর এক বিছানার শরিক হওয়া সত্ত্বেও চেনা যাচ্ছে না।

এখন যদি রাধা ওখান থেকে সরাসরি সামনে এসে—না, শুধু সামনে নয়, সেই ঘরটায় সেই বিছানাটায় মুখোমুখি পাশাপাশি হয়ে বসে বা শোয়—তখনো কি অচেনা লাগবে? না, না, তা হয় কখনো? যদি হয়, হবেই তো, ও যে অচেনা—কেমন করে এক ঘর এক বিছানায় দেখা হতে পারে? অসম্ভব। কিন্তু তা হলে?

তা হলে আবার কি? অচেনা মানেই বা কি? কিছু না কিছু না—বিকার। স্ত্রী আবার অচেনা—হ্যাঁ: যত সব।

কিন্তু না।

রাধাকে যেন আরো কোনদিন বা কখনো কোন সময় এমনি অচেনাই মনে হয়েছিল। সে কবে যেন—কবে যেন! হ্যাঁ, সেই এক মধ্যরাতে বহু বছর আগে। তখনো আর সে নতুন স্ত্রী নয় অবশ্য,—সাবেকী আটপৌরে। ঘুম ভেঙেছিল মাঝরাতে। বিছানায় উসখুস লাগছিল। ঘরে এবং বাইরে তখন অন্ধকার। চারিপাশ তখন নিঃশব্দ। কোন গাছে পাখীর পাখা ঝাপটানির শব্দটি নেই, না, পথে কুকুরের ডাকও নেই।

বিছানা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বোবা বাড়ীগুলো দেখতে ভাল লাগছিল ভাল লাগছিল আকাশ দেখতে। এবং এই সব দেখতে দেখতে কী যেন অনুভবের সীমানায় এসে দাঁড়ালো। নিঃসঙ্গতা।

ভয় লেগেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঘরে আলো জ্বালতে হয়েছিল ভয় কাটাতে। রাধার সংগ দিয়ে নিজের ঐ মুহূর্তের নিঃসঙ্গতা কাটাতে। আলোতে রাধার ঘুম ভাঙেনি। ঘুমে অচেতন। চোখ দুটো সম্পূর্ণ বোজা নয়—তবু বোজাই। পলকের ফাঁকে চোখের সাদা মণি অনেকটা বেরিয়ে আছে। হয়ত মুখে নিঃশ্বাস টানছে তাই ঠোঁট দুটো যুক্ত নয়। মুখে কোথাও কোন পরিচিতের চিহ্ন নেই।

রাধাকে তখন অচেনা লেগেছিল। ভীষণ অচেনা। ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্ট কেন, ভাবা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল যে রাধা অনেকদিনের স্ত্রী—একঘর এক বিছানা অনেক কলহ প্রণয়ের অংশীদার। রাধাকে অচেনা লাগলো—এত অচেনা যে ঐ নিঃশব্দ রাতে এক ঘরে ওর সংগে অবস্থান করতে কেমন অশালীন কেমন অবৈধ মনে হচ্ছিল। বাইরে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু ওখান থেকেই তো একটু আগে সেই নিঃসঙ্গতার তাড়নাতেই ঘরে আসা—সংগ খোঁজা।

তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে অন্ধকারকে ডেকে আনা—সব কিছু অন্ধকারে মিশিয়ে দেওয়া। তারপর ঐ একই বিছানায় অদৃশ্য দুর্ভেদ্য পাঁচিল টেনে একপাশে গুটিসুটি শুয়ে থাকা—অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়া।

সকালে তো রাধাই চায়ের কাপ হাতে ঘুম ভাঙালো। ওঠো কত বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে—বাজার-ঘাট অফিস নেই। তখন তো সেই রাধাই সাবেকী আটপৌরে বহুদিনের ব্যবহৃত অভ্যস্ত স্ত্রী। ঠিক আজকের সকালের মতই হেসে কিংবা গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিল—যেমন করে চেনা মানুষ ঘরের মানুষ মনের মানুষ কথা বলে। অবশ্য কী সেদিন বলেছিল ঠিক ঠিক মনে নেই—আজ সকালের কথাই মনে আছে? স্ত্রী কখন কি বলে তা মনে রাখা অসম্ভব? নয় বোধ হয়।

তবু স্ত্রী তো চেনা মানুষ—এতে ভুল হবে কেন?

ভুল তবু হচ্ছেই, রাধাকে অচেনা লাগছে।

এখন মনে হচ্ছে—আজ এই মুহূর্তে এবং সেই মধ্যরাতে ছাড়াও যেন কখনো কখনো রাধাকে চিনি না মনে হয়েছিল।

কেন। সেই একদিন, মনে পড়ছে। রাধা পুত্র কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়ে বারান্দায় এসে স্নানপূর্ব কেশচর্যায় বসলো—খোলা বারান্দা—ওপরে আকাশ সামনে উঁচু নীচু বাড়ীর মাথা পেরিয়ে দিগন্ত। রাধার হাত ও চুলের মেশাধেশি আলুথালু বসা—চোখের দৃষ্টিতে না-আকাশ না-দিগন্ত তবু স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি—যার রশ্মিতে পুত্র-কন্যা অথবা তাদের পিতা (যে কিনা সেদিন আকস্মিকভাবে বাড়ীর মধ্যে রাধার সীমানার মধ্যেই বর্তমান) কেউই ভাস্বর নয়।

তখন রাধাকে দেখে কেবল মনে হয়েছিল—ওকে তো চিনি না—কোনদিনই চিনি না। এত অচেনা মনে হয়েছিল ওর সামনে গিয়ে চেনার দাবী জানাতেও বুক দুরু দুরু করছিল। আসলে হাজার চেষ্টা করেও ওর সামনে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

অথচ ঐ রাধাই এক সময়, মনে পড়ছে, ভিজে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে এসে 'দেখি এখন জ্বরটা না' কী যেন বলেছিল। গায়েও হাত রেখেছিল—জ্বরের সবটুকু তাপ যেন তার হাতের স্পর্শে শুষে নিচ্ছিল, তখন, কিন্তু রাধা সেই রাধাই।

তা হলে—কেন। না, না, এ কেমন করে হতে পারে। এই হঠাৎ—হঠাৎ চিনিনা—চিনিনা কেন মনে হবে?

এমন হয় না কি আর কারো?

ঐ যে পাশে যে ভদ্রলোক বসে চীনেবাদাম ভাঙছে, দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাচ্ছে, কিংবা কাজে বিনাকাজে চলাফেরা করছে—দাঁড়িয়ে আছে—বসে আছে এখানে ওখানে তাদের, যাদের স্ত্রী আছে যে স্ত্রী অনেক বছরের—এমন হয় নাকি?

আচ্ছা যদু মধু শ্যামবাবু আপনার স্ত্রীকে দেখে কি কখনো ভেবেছেন যে তাকে চেনেন না কিংবা পরিমাপ করেছেন আপনার স্ত্রী কতটা চেনা কতটা অচেনা অথবা একেবারেই অচেনা।

With best compliments from :—

MOTILAL INDERCHAND

GENERAL MERCHANT & COMMISSION AGENTS

65, COTTON STREET
Calcutta-7

রজনীগন্ধার বয়স

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

কোন কিছু করতে না পারার ব্যর্থতা তিল তিল করে সমাকে আহত করেছে, তিলে তিলে আহত শরীরে অর্জন করেছে এক অলৌকিক বিশ্বাস : যাকে না পেলে বেঁচে থাকা যায় না, বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না, তাকে গ্রহণ করার মন্ত্র।

সমার কাছে এখন এক বা বহু দু-ই সমান। একের মধ্যে যেমন বহুকে দেখে, এক-কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে বহুতে, তেমনি বহুর প্রতিটি অংশে পূর্ণ অস্তিত্বের সন্ধান করতে গিয়ে সেই একের মধ্যে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সমা যা মনে করে সে কথা ঘটা করে বলার নয়, শুধু উপলব্ধির, অনুভবের। তবু সমা একদিন, কিছু বলার জন্যেই, ফোন করেছিল আপ্তাকে, বলেছিল, আয় না একদিন। একেবারে ভুলে গেলি ?

আপ্তা জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন আছিস ?

ভালোই।

যাব সময় কোরে। তুই কখন থাকিস ?

কখন না থাকি বল ! সব সময়ই।

ফোনের ওদিকে হাসির শব্দ। তেমন আর কোন কথা হয়নি।

আপ্তা সমার ফোন পেয়েও সেদিন বা পরের দিন আসেনি। বরং অনেকদিন পরেই আপ্তা এলো। এসে নিজেই একগাদা কৈফিয়ৎ দিল, কদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু একেবারে সময় করে উঠতে পারছিলাম না। কি খবর তোর ? স্কুলে যাস না, লম্বা ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছিস, কি ব্যাপার বল তো ?

সমা একটা চেয়ার এগিয়ে দেয় আপ্তাকে। বসতে বলে। আপ্তা ওর টেবিলে মুখোমুখি বসলো। কাগজ গুঁজে বই বন্ধ করে রাখতে রাখতে বললো, এতোদিনে তোর সময় হলো ?

তোর তো তাও হলো না কোনদিন।

সমা ইতিমধ্যে আপ্তার বাসায় অনেকদিন গিয়েছে। বললো, সত্যিই কদিন ঘুরে এসেছি। তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, সমা জোরের সঙ্গে বলে।

কি খবর, ডেকেছিস কেন ?

এমনি, এমনি ডাকতে নেই ? মৃদু হাসে সমা। যখন আসতে বললাম, তখন তোর সময় হয়নি।

এখন বল। সমাকে লক্ষ্য করে আপ্তা বলে, তোকে দিন দিন আরো রোগা লাগছে। তোর যেন কি হয়েছে।

সমা বুঝতে পারে, বুঝতে পেরে বলে, না উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু ঘটেনি।

আপ্তা হেসে বলে, তাহলে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যেখানে উদ্বিগ্নতা নেই, কিন্তু তুই দেখছি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিস !

সমা কি উত্তর দেবে ভাবছে। সমা বন্ধ করা বইটায় মলাট তুলে একটার পর একটা পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলো। বইর পৃষ্ঠাগুলো এগিয়ে চললো, পৃষ্ঠার অক্ষরগুলো সারিবদ্ধ চলমান বিশাল এক পঙ্‌ক্তি কালো মাথার মত মনে হচ্ছিল। সমার মনে হল, ওরা কেউ দাঁড়াচ্ছে না। ওই বিশাল পঙ্‌ক্তিটাকে ছোঁয়া যায় না, ওরা কারা ? কোথা থেকে এলো কেনই বা এলো সমা বুঝতে পারে না। ওই কালো শব্দগুলোর কালিহীন কতগুলো শাদা শব্দর বাঙময় অস্তিত্ব হেঁটে বেড়াচ্ছে। সমার মনে হল, যে কথা না বললেও চলে, অথচ না বলে থাকা যায় না, বলেও যে হাল্কা হওয়া যাবে তাও নয়, যা শুনে আপ্তা বা কারোর কোন কাজে লাগবে না, অথচ তেমনি একটা কথা সমা আপ্তাকে বলতে চেয়েছিল। এ যেন বলতে হবে বলেই বলা। না বলে থাকার উপায় নেই বলেই বলে ফেলা। কিন্তু যেদিন যখন যে মুহূর্তে মনে হয়েছিল আপ্তাকে বলা চলে, আজ এখন এ মুহূর্তে আপ্তাকে বলার কোন তাগিদ মনে করছে না সমা। সমা ভাবে, এমনি অবস্থা নিশ্চয়ই আপ্তারও কখনো কখনো হয়, ও নিশ্চয়ই বুঝবে। আপ্তা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। যেদিন বলবে ভেবেছিল, সেদিন শব্দগুলোর মধ্যে দূরারোগ্য পঙ্গুতা অনুভব করেনি।

সমার মনে হয়, কোন কথাই জিব বা ঠোঁটের একিয়ারে নয়, অন্যত্র, কোথায় যেন অন্তর্গত এক বুদ্ধির চাতুর্য খেলা করে, যে পাহাড় ফাটিয়ে প্রস্রবণের জন্ম দেয়, যে তপ্ত লাভায় স্নান করাতে পারে, সে সমাকে এখনি, এ মুহূর্তে কথা বলতে দিচ্ছে না।

সমা অন্যরকম ভাবতে চেষ্টা করে। ভাবতে চায়, আপ্তা কেন সমাকে

দেখে বুঝতে পারছে না। সমা তো আপ্তাকে দেখে সব বুঝতে পারছে। অথচ আপ্তা কেন পারছে না। আপ্তাকে খুব অশিক্ষিত অসংযমী মনে হয় সমার। সমা যে কোন মেয়ের পরনের শাড়ি, শাড়ির রঙ, গায়ের ব্লাউজ, ব্লাউজের ছাট, ও রঙ, ব্লাউজের মধ্যের ছোট জামা, আঁচল ছোট কি বড়, শায়া একটা কি ভিতরে আরো দুটো পড়া এসব দেখে বুঝতে পারে তাকে। বুঝতে পারে সে কি বলতে চায়।

সমা জানে সবাই অল্পবিস্তর অপরের চিন্তা পড়তে পারে, বুঝতে পারে। বোঝার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন, সমার মনে হল, আপ্তার মধ্যে আজ সে মনোযোগ নেই। তবু আপ্তাকে বলতে হবে।

এক সময় সমা আপ্তাকে বলেই ফেললো।

বলতে না পারা পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল সমার। আপ্তা তত অশিক্ষিত নয়, যত অমনোযোগী। এজন্য সমার রাগ হচ্ছিল।

বলে ফেলার পরে, অর্থাৎ বলতে পারার পরে সমার আর কোন অস্বস্তি থাকলো না। এখন সমার আর কোন দায় দায়িত্ব নেই। কোন প্রশ্ন না করেও সমা নির্লিপ্ত চোখে আপ্তার দিকে তাকালো।

আপ্তা অবাক হয়ে যায়। আপ্তার মনে হয় সমা শাদাটে হয়ে যাচ্ছে। সমা কি করলো! সমার মত শান্ত নিরীহ গোবেচারা মেয়ে, যে সমা জোরে একটা কথা বলেনি কখনো, জোরে হাঁটেনি, চীৎকার করেনি, হৈ হুল্লোড়েও ছিল না, যে সমা কোন ছেলের চোখে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি, তার পক্ষে কি করে এমনটা সম্ভব হলো, আপ্তা ভেবে পায় না।

আপ্তা আবার জিজ্ঞাসা করে, কতদিন হলো?

আট মাস হবে।

বাইরে থেকে তো কিছু, অন্তত দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

সমা হেসে বলে, বাইরে থেকে তো অনেক কিছুই বোঝা যায় না, না হলেও ভিতরে বেশ বুঝতে পারছি। কিছু খেতে পারি না। শুধু ঘুম পায়, অথচ ঘুমুতে পারি না, ঘুমের মধ্যে ভয় হয়, আমার ঘুম যদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে? সমা আরো নিবিড় হয়ে ওঠে নিজের অনুভূতিতে, না ঘুমিয়ে ওর নড়াচড়া স্পর্শ করতে ভালো লাগে।

সমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কে? আপ্তা জানে, সমা নিজের বাবা আর ভাই ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলেনি। এ বয়সে, বয়স

তো নেহাৎ কম হয়নি, কে এলো, যদি এলো, এভাবে লোক না হাসিয়ে সামাজিক ভাবে এলেই ভালো হত! সমাকে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না আপ্তা, কে? সমা কোন উত্তর দেয় না। আবার তার জিব আড়ষ্ট হয়ে আসে। সমার মুখ দেখে স্পষ্ট মনে হয়, সমা কিছু মনে করার চেষ্টা করছে; চোখের সামনে অনেক মুখ ভেসে ওঠে, টুকরো টুকরো স্মৃতির মতো ছবি, কখনো চাপ চাপ রক্তের মতো স্মৃতির শাখাপ্রশাখায় ঝুলে থাকা অব্যক্ত যন্ত্রনা, ব্যর্থতা, খসে পড়া শুকনো দুএকটা পাতার মত ভালবাসা। কারা যেন সে শাখায় দোল খায়, হাওয়ায় তাদের চুল ওড়ে, ডালে ডালে ফুল ফোটায়! বিভিন্ন ফুল, গোলাপ টগর জুঁই পাশাপাশি একডালে ফুটে আছে। সমা প্রতিটি ফুলের নাম জানে, প্রতিটি মানুষের নাম। সমা সবাইকে জানে, সবাই কোনো এক সময়, একটি বিন্দুতে বিলীন হয়ে যায়। সবাই মিলেমিশে কেমন অদ্ভুতভাবে একজন হয়ে যায়। তার নাম কি বলবে আপ্তাকে। আপ্তা কি ঠিক বুঝতে পারবে সমাকে?

একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে! তাহলে বিয়ে করে ফেল! ও-কে বলি! ব্যবস্থা করুক। নাম ঠিকানা দে।

উমেশবাবুকে!

হ্যাঁ, লজ্জার কি! ও-তো তোকে জানে।

সমা ঠোঁটের ফাঁকে হাসে। আপ্তা বিরক্ত হয়। বলে, ছেলেমানুষী রাখ সমা, এ বয়সে এসব মানায় না।

বয়সের দোষ কি? কোন কিছুরই বয়স আছে নাকি?

আপ্তা সমার জন্য কি করতে পারে ভেবে পায় না। বলে, ডাক্তার দেখিয়েছিস? কেউ জানে এখনো।

কেউ জানে কি না, জানি না, তবে আমি জানি। কাল ডাক্তার সেনের কাছে যাচ্ছি, সন্ধ্যায়।

আমি আসব?

কি দরকার!

সমার কথায় আপ্তা মিইয়ে যায়। আপ্তার একটু সাহায্যও নিতে চায় না সমা!

সমা যখন কোন কিছুই চায়না, সঙ্গও চায় না, তখন আর কিছু না বলে আপ্তা চুপ করে যাওয়াই ভালো মনে করে। সমার সামনে থেকে উঠে

আপ্তা অন্য ঘরে যায়। সমার মা বাবার সঙ্গে দেখা করে। ছোট ভাই বোনের সঙ্গে কথা বলে। সবার সঙ্গেই কথা বলে, সবার সঙ্গে কথা বলতে আপ্তার ভাল লাগে। আপ্তার পাশাপাশি সবার সামনে দাঁড়াতে পারবে না সমা, ভালোলাগেনা, সমা উঠলো না, আপ্তাই ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে গল্প করে যাবার সময় সমাকে বলে চলে গেল। যেন সবার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল, যাবার সময় তেমনি সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল আপ্তা। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে সমা। সমার হাসি পেল ভেবে, সমাকে আপ্তা জানে, সমাকে উমেশবাবু জানে। সমাকে যেন দুনিয়ার লোক জানে! যারা না দেখেছে তারাও। লোকগুলো কি পাগল! যারা জানে, তারা কি জানে! সমা কি ভাবে হাসে, কি ভাবে চুল আচড়ায়, কি ভাবে শাড়ি পড়ে, কি জুতো পায়ে দেয়, এ ছাড়া আর কি জানে? জানে সমার মা আছে, বাবা আছে, ছোট ভাইবোন আছে, সমাকে সংসার চালাতে হয়, সমা স্কুলে পড়ানোর চাকরী করে, ভাইবোনকে পড়ায়, আর কি জানে, সমার নিজের একটা ঘর আছে, একটা টেবিল, তক্তপোষ, একজনের মত বিছানা, দুটো বালিশ, টেবিলে গোটাকয় বই, খবরের কাগজ, একটা ব্যাগ, সাদা কাগজ, কলম, দেয়ালে একটা আয়না, চিরুনি, পাউডার, একটা কাঠের আলমারি, আলমারিতে গোটাকয় শাড়ি, ব্লাউজ ব্রেসিয়ার, একজোড়া অতিরিক্ত চটি, এসব তারা জানতে পারে। এসব জানে আপ্তা উমেশবাবু সমার মা বাবা ভাইবোন।

সমার বাবা শিবতোষ হালদার হয়তো আরেকটু জানেন, সমা মাঝে মাঝে রাত্রে দরজা খুলে কোথাও যায়! সমার মাও জানেন। আগে জিজ্ঞাসা করতেন, কে!

আমি মা।

আলো জেলে নে, অন্ধকারে ভয় পাসনি।

এখন আর জিজ্ঞাসা করে না। তারা জানে, ঘুম না এলে সমা রাত্রে বিছানা থেকে উঠে ছাদে যায়। ছোট একটা ছাদ আছে বাড়িটার। সমা জানে, ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে আকাশ দেখা যায়। আকাশ থেকে মুঠোমুঠো তারা অভ্রগুড়োর মত সমার পায়ের নীচে ছড়িয়ে পড়ে, তারাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আকাশটা আরো কত উঁচুতে উঠে যায়, শিবতোষবাবু তা জানেন না।

সমা ছাদে যায় ঘুম আসে না বলে, ঘুম আসে না বলে সমা বাথরুমে যেতে পারতো, ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে, একটা গল্পের বই পড়তে শুরু করতে

পারতো, সমার ছোট মাসি যা করে। সমা আগে খুব বই পড়তো, এখন বই দেখলে সরিয়ে রাখে, বড়জোর পৃষ্ঠা উল্টায়, পড়তে পারে না, পড়তে গেলে শাদা কতগুলো অক্ষর ভেসে ওঠে। ঘুম না পেলে ছাদে যায় সমা, কেন যায় গিয়ে কি করে, কেউ জানে না।

সমা জানে, তাকে কেউ জানে না। জানতে চায় না। বুঝতে চায় না। অথচ সমার কাছে তাদের অনেক চাহিদা। চাহিদা না মেটালে সমার রেহাই নেই। সমাকে শিশিরের মত রৌদ্রে শুকিয়ে যেতে হবে তাদের চাহিদা মেটাতে মেটাতে। অথচ সমাকে কেউ জানতে চায় না। সমার কি ইচ্ছে করতে পারে না যে সমাকে অন্তত কেউ জানুক! সে ইচ্ছা কি সমার পক্ষে খুব অপরাধের হবে?

আপ্তা চলে গেলে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে সমা। ভাবে আপ্তার কথা, আপ্তার উনি, উমেশবাবুর কথা। আপ্তার বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, সমার বিয়ে হয়নি, করেনি, চাকরী করে। আপ্তার কথা ভেবে হাসি পায়, উমেশবাবুকে আপ্তা বুঝিয়েছে, সমার মত মেয়ে হয় না, সমা বিয়ে করেনি, সংসার দেখে, বাবা মা ভাইবোনের সংসার। এমন দেখা যায় না আজকাল। উমেশবাবু তাই জানে আপ্তা তাকে যা বোঝায় তাই বোঝে, যা জানায় তাই জানে। সমার মনে হল উমেশবাবুরা হাজার হাজার উমেশবাবুরা নিজেরা কিছু বোঝেনা। আপ্তারা যা বোঝায় তাই বোঝে।

ফলে উমেশবাবু তার স্ত্রী আপ্তাকে জানে না। আপ্তা উমেশবাবুর সংসার দেখে, আপ্তা উমেশবাবুর ঘরে রান্না করে, খেতে দেয়, ঘর গোছায়, উমেশবাবুর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়, শুতে হয়, আপ্তার নিজের সংসার নেই। নিজের সংসার বলতে কি বোঝায় তাও স্পষ্ট করে গুছিয়ে বুঝে উঠতে পারে না সমা। শুধু সন্তান নিয়েই কি সংসার। ছেলেমেয়ে! আপ্তা যতখানি বেঁচে আছে তা উমেশবাবুর জন্যে নয়, নিজের জন্যে, নিজের জন্যেই ছেলেমেয়ে আপ্তার, সেই ছেলেমেয়ের জন্যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের জন্যেই আপ্তার বাঁচার চেষ্টা! তাহলে উমেশবাবু আপ্তার কেউ নয়। আপ্তা যাবার আগে যখন একবার সমার দেয়ালের আয়নার মধ্যে তাকিয়েছিল, সমার মনে হয়েছিল, আপ্তা আয়নার মধ্যে ঢুকে যেতে চেয়েছিল। আয়নার মধ্যের রাস্তাটা যদি আপ্তার জানা থাকতো, তাহলে আপ্তা দরজা দিয়ে বাইরে চলে যেত না, অন্য কোথাও, অন্য কোথাও চলে যেতে চেষ্টা করতো, হয়তো অন্য কোথাও চলে গেত।

এভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে কাউকে দেখেননি। সমা টেলিফোনে ডাক্তার সেনকে বলে রেখেছিল, সে কোন কারণেই নষ্ট করতে চায় না। ডাক্তার সেন হেসে বলেছিলেন, বেশ তো নষ্ট করবেন কেন ?

কিন্তু পরীক্ষা করে যা দেখলেন, তা সমার কথার সঙ্গে কোন মিল নেই। প্রেগনেনসির কোন লক্ষণই নেই তার শরীরে। সে কথা অবশ্য সমাকে বললেন তিনি। তাছাড়া আর যা মনে হয়েছিল, সে কথা বলেন কি করে! বলা যায় না। সমার সঙ্গে হয়তো কোনদিন কোন পুরুষের দৈহিক মিলনই ঘটেনি, কিন্তু এতো অনুমানমাত্র, এই অনুমানের কথা তাকে বলে কি করে।

রোগী হয়ে সমা তার কাছে এলেও, তিনি জানেন সব কথা রোগীকেও বলতে নেই। তবু যেটুকু বলেছেন ডাঃ সেন, তাতেই ডাক্তারের প্রতি অবিশ্বাসে সমার মন ভরে উঠেছিল। ডাক্তার সেন হেসে বলেন, আপনি ভালো আছেন মিস রায়।

ডাক্তার সেনের সামনে টেবিলে মাথা গুঁজে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সমা। সমা বলতে চাইলো, ডাক্তার, আপনি ভুল পরীক্ষা করেছেন। আমার নিদ্রা জাগরণে শরীরের মধ্যে শিরায় শিরায় যে হেঁটে বেড়ায় মেঘের মত হাল্কা শিশিরের মত নিটোল শরীর নিয়ে সে কি মিথ্যা? সে কি কিছু নয়? হয় সে এতো ক্ষুদ্র অথবা এত বিশাল যা আপনার চোখে ধরা পড়েনি, বা আপনি বুঝতে পারেন নি।

Telegram : NISWARTHI (C)

Telephone : { GIDDI—34-5481
RESI.—33-7634

With best Compliments of :

Tawaniram Ramnarayan

IMPORTERS & EXPORTERS

1, GOBIND CHANDRA DHAR LANE
CALCUTTA-1

With best Compliments of :

Phone : 34-7957

DEEP PRINTERS

9, Peary Mohon Paul Lane
Calcutta-7

অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়েছিল ক্ষুধার লাভা ; তারপর ধীরে ধীরে মাধবীলতার মত বড় হয়ে ওঠার পর একদিন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল এই যে সমা, এর নাম সমা। সমার মনে হয় এই তো সমাজ, এই নিয়ে সংস্কার, সংস্কারের সংসার। যে সংস্কার বিশ্বাসী, সে সমাজভুক্ত। যার সংস্কার নেই, তার সমাজ নেই। সত্যকাম ছিল সমাজ পরিত্যক্ত। সত্যকামকে যদি জবালা একটা নাম শিখিয়ে দিত, একটা নাম, যে কোন একটা গোত্র, তাহলে সেদিন সত্যকামের সহপাঠীরা কৌতুকের হাসি হাসতে পারতো না। সমার বলতে ইচ্ছে করে, তোমরা হাত তুলে বলো, তোমরা কে কে জাবালা নও। তোমাদের সত্যকামেরা বেশি বুদ্ধিমান, তাই কাউকেই চোখের জলে স্কুল থেকে ও ভাবে ফিরতে হয় না। সমা অবাক হয় সত্যকামের কথা ভাবে, সত্যকাম যদি জানতেই চাইতো তার জন্মের রহস্য কোথায়, তাহলেও কি সে খাঁটি ব্রাহ্মণ হতে পারতো না ? পরক্ষণেই সমার মনে হয়, হয়তো সত্যকাম অনুসন্ধান করেছিল, করে জানতে পেরেছিল যে এ রহস্য চিরআবৃত থাকে, জানা যায় না, জানতে দেওয়া হয় না। এই গোপনতা দিয়েই সংস্কার বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

আপ্তা অনেকক্ষণ চলে গেছে, এতক্ষণে হয়তে উমেশবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেছে। আপ্তার স্বামী সম্পর্কের একজন পুরুষ উমেশবাবু। সমার মনে হয়, উমেশবাবু না হয়ে যে কোন উমেশবাবুই আপ্তার স্বামী হতে পারতো, বা ওই উমেশবাবুর যে কোন একজন মহিলাই তার স্ত্রী হতে পারতো, সমার ভাবতে কেমন লাগে, যে কোন একজন পুরুষ ও যে কোন একজন মহিলা—স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়।

আপ্তা বলছিল সমাকে, বিয়ে করে ফেল, অন্তত এ অবস্থায় বিয়ে করে না ফেললে, একটা সমাজে বাস করতে হয় আমাদের, সংস্কার আছে, তা তো মানতেই হবে, যে আসছে তার কি পরিচয় দিবি।

একজনকে পথের থেকে ধরে এনে বিয়ে করলেই পরিচয় তৈরী হয়ে যাবে !

তা কেন করবি, যে ওর সত্যিকারের পরিচয়, তাকেই বিয়ে করবি !

তাকি হয় ? সব সময় তাকেই কি বিয়ে করা যায় ? সবাই কি সবার বিয়ের যোগ্য হতে পারে ? এছাড়া যাকে বিয়ে করা সম্ভব, তাকে বিয়ে করে ওর পরিচয় দিলে, সেই পরিচয়টাই যে বড় মিথ্যে হবে আমার সন্তানের পক্ষে। সৃষ্টির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি, সম্পর্কের অস্তিত্বকে নয়।

আপা বলছিল, বিয়ে কর, নতুবা নষ্ট করে ফেল। তোর ওসব কথার কোনো মানে হয় না।

সমা জানে, আপার কাছে দুটোই সোজা। দুটোই করেছে সে। বিয়ে করেছে, এবং বার কয়েক নষ্টও করেছে। সমা আর যাই করুক, নষ্ট করবে না, নষ্ট করতে পারে না সে।

ওকে নষ্ট না করলে, লোকে তো কেই নষ্ট বলবে।

সমার হাসি পেয়েছিল শুনে। বলেছিল, একজনকে নষ্ট করতে পারলে, আমি আর নষ্ট থাকবো না, একজনকে খুন করতে পারলে, আমার আর নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। একজনকে বাঁচিয়ে রাখলে আমি খুন হব, একজনকে বাঁচিয়ে রাখলে, যে আমার রক্তে মাংসে গড়া আমার সন্তান, তাকে বাঁচাতে গেলে আমি নষ্ট বলে প্রমাণিত হব। চমৎকার ব্যাখ্যা।

সমা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, নষ্ট সে করবে না। দেখতে চায়, জানতে চায়, খোলস ছেড়ে একটা বীজ কিভাবে একটা শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসে, একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীর, তা-ও সমার। নষ্ট করে ফেললে, এই অলৌকিক দেখা আর কোনদিন হবে না সমার। সমা নিজেই ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে, সব কথা জানিয়ে রেখেছে ফোনে।

ডাক্তার সেন হাত ধুয়ে এলেন, তোয়ালে টেনে নিয়ে হাত মুছলেন। সমা তার টেবিলের মুখোমুখি চেয়ারে বসে। সমার শরীরে চোখে মুখে ক্লান্তি। ডাক্তার সেন সমার ক্লান্ত অবসাদ বিপন্নভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হচ্ছিলেন। ডাক্তার সেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, মিস রায় আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনাকে কোন ঝামেলাই নিতে হলো না। ডাক্তার সেন আরো কিছু বলতে চান, কিন্তু বলতে পারছেন না।

ডাক্তার সেন সমাকে পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেছিলেন, টেবিলের ওপর সমা ঘেমে স্নান করে ফেলেছিল, তার ভীত শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছিল। চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠেছিল, জলে থৈ থৈ করছিল। ডাঃ সেন টেলিফোনে সমার থেকে যা রিপোর্ট পেয়েছিলেন, তার কোন মিল খুঁজে পেলেন না। ডাক্তার সেন যখন সমার শরীরে হাত দিয়েছিলেন পরীক্ষার জন্যে, তখন সমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সমাকে পরীক্ষা করার আগে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যই ডাক্তার সেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। ডাক্তার সেন একটু বিব্রত হয়েছিলেন। পরীক্ষার সময়

আপ্তার আয়নার মধ্যে তাকানো দেখে মনে হয়েছিল, আপ্তা দরজা পার হয়ে সোজা বাড়ি যাবে না। বাড়ি যেতে যেতে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। কিছুক্ষনের জন্য উমেশবাবুর বাড়ি ভুলে যাবে। কেউ কেউ ভোলে। কেউ বাড়ি যেতে যেতে বাড়ির রাস্তা ভুলে যায়। চেনা মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার নাম ভুলে যায়। অচেনা কোনো মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকটা মুখ খোঁজে। শরীরের মধ্যে আরেকটা শরীর। একটা মানুষের মধ্যে আরেকটা মানুষ। টুকরো টুকরো মানুষগুলোর মধ্যে সেই পরিপূর্ণ মানুষটা খোঁজে।

অথচ সেই মানুষটাকে পাওয়া যায় না। না পেয়ে হতাশ হতে হয়। কেউ মানিয়ে নেয়। কেউ পারে না। কেউ ছলনা করে, চাতুরী করে, সমার কিছুই করার নেই।

সমা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তখন কারো সঙ্গে দেখা হয় না, দেখা হলেও অবাক হয়ে 'আরে, তুমি' বলে দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে না, বলতে ইচ্ছে করে না, 'আগে চিনতেই পারিনি, তুমি কি ভয়ানক পাল্টে গিয়েছ,' অপরের পাল্টে যাওয়ার সমার কোন বিস্ময় নেই, সবাই তো পাল্টায় কেই বা দাঁড়িয়ে থাকে, সমা কি দাঁড়িয়ে আছে! পুরণো দিনের গল্প বলে না, ছোটবেলায়, দুপুরের কথা, পালিয়ে কাদের পেয়ারার ডাল ভেঙে পালিয়ে আসার কথা, সেই নদীর পাড়, গাছ, গাছের ছায়া, সেই দুপুর, সেই বয়স, সেই দুপুরের বয়স, সেই ছেলেমানুষী ; ছেলেমানুষী, ছেলেমানুষী, ছেলেমানুষী ছেলেমানুষী, জীবনের সবটাই ছেলেমানুষীতে ভরে গেল। 'আমাদের বাড়িতে একদিন এসো' বলতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতে ভুলে যায়। ভুলতে ভুলতে সবাই একদিন সব ভুলে যায়।

আপ্তা অমন করে আয়নার মধ্যে না তাকালে এসব কথা সমার মনে হত না। সমা আয়নার মধ্যের রাস্তাটাকে জানে বলেই আয়নার মধ্যে কেউ তাকালে তার কেমন যেন মনে হয়। সমার মনে হয়েছে আপ্তা আয়নার মধ্যে সেই রাস্তাটাই খুঁজেছিল। সমা আয়নার মধ্যে নিবিড় চোখে তাকালে দুটো সিঁড়ি দেখতে পায়। একটা ওপরের দিকে উঠে গেছে, আরেকটা নিচে। সমা নিচেরটায় একবার গিয়েছিল, সেখানে ভালো লাগেনি। যতদূর গিয়েছে তত একা হয়ে যাচ্ছিল, যত হাঁটছিল তত খারাপ লাগছিল, মনে হচ্ছিল ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে, যতদূর যাবে, যততদূর যাবে, ততদূর সব ফুরিয়ে যাবে। দূরে দূরে কঠিন রুক্ষ এলোচুলো গাছগুলো দাঁড়িয়েছিল, শুকনো

শাখাগুলো ধনুকের মত বেঁকে কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে হাসছিল, তিরন্দাজ বৃক্ষগুলোর শাখায় শাখায় বিষাক্ত তীর। সমার ভয়-ভয় করছিল, হাত-পা বুক ঠোঁট চোখের পাতার মত কাঁপছিল, সমা এক নিঃশ্বাসে পালিয়ে এসেছিল আর যায়নি ওদিকে বরং ওপরের সিঁড়িটা দিয়ে যত পেরেছে উঠেছে, যত উঠেছে তত আনন্দ পেয়েছে, তত আলো শৈশব পেয়েছে; এতো আলো এতো প্রাচুর্য এত সূর্য কোনদিন দেখেনি সমা। সমার মনে হয়েছে, সমস্ত জীবনটাই যদি শৈশবের ইস্পাতে মুড়ে রাখা যেত, বেঁচে যেত, সমা বেঁচে যেত। সমা শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে আরো আরো আগে চলে যায়। আরো আগের সেই উষ্ণ গোলার্ধে, জন্ম মুহূর্তের আগে, ভ্রূণের মধ্যে, কে তার মা, কে তার পিতা যেখানে জানে না; শরীরের মধ্যে, যৌন আনন্দের প্রজাপতির ডানার মধ্যে চলে যায়, ভ্রূণের মধ্যে অন্ধ প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভ্রূণের মধ্যে সমা অন্ধ চোখে নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করে। সেখানে কার যৌথ আনন্দের প্রজাপতি সে, সৃষ্টির অতিরিক্ত কোথাও কোন চিহ্নের অস্তিত্ব নেই। সমার মনে হয়, তাহলে সৃষ্টিই আসল, আর সব ভুয়া, ফাঁকা, বুজরুকি, সংস্কার। উঠতে উঠতে এক ভয়াবহ জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সমা। অন্ধ একদলা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড হয়ে মনে হয়েছিল, আমি কি? কাউকে দেখতে পাচ্ছিলনা। নিজের স্থূল অস্তিত্ব ছাড়া আর কারো কোন অস্তিত্ব টের পেল না। এক ফোঁটা জলের মধ্যে মশার ডিমের মত নিজেকে মনে হল সমার। কোন সাক্ষর বা প্রমাণ না পেয়ে সমার মনে হল, কোন পিতাই কোথাও তার অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে যায় না। ডিমের মধ্যে একটা শরীর যেকোন পরিচয় নিয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, নদীর চড়ায় বালিতে ঢাকা কাদের যেন ডিম দেখেছে সমা। পাখির বাসায় কাদের ডিম দেখেছে সমা, সম্ভবত পাখিদের, কোন পাখিটার, তা কোন পাখিই জানে না, আরশোলাকে দেখেছে কোন এক অন্ধকার নির্জনে নিজেদের ডিমের শরীরটাকে রেখে যায়; ইলা মাসির নিঃসন্তান নিরিবিলি বুকে কে যেন একটি শিশুকে এনে দিয়েছিল, সে তখন কিছুই জানতো না; এখন জানে, লোকে শিখিয়েছে, ইলা মাসি, তার বর শিখিয়েছে—তাদের মা বাবা ডাকতে, সাত বছরের মেয়েটি তাই ডাকে, তাকে যা জানানো হয়েছে সে তাই জানে। সমার অদ্ভুত লাগে এসব। এ সব ভাবতে ভাবতে নিজেকেও মনে হয়েছে কখনো কখনো কে যেন কোথা থেকে ইলা মাসির মেয়েটার মত অমনি এক শিশুকে কার কোলে দিয়েছিল, কিংবা আরো আগে নিঃস্ব অসহায় প্রার্থিত

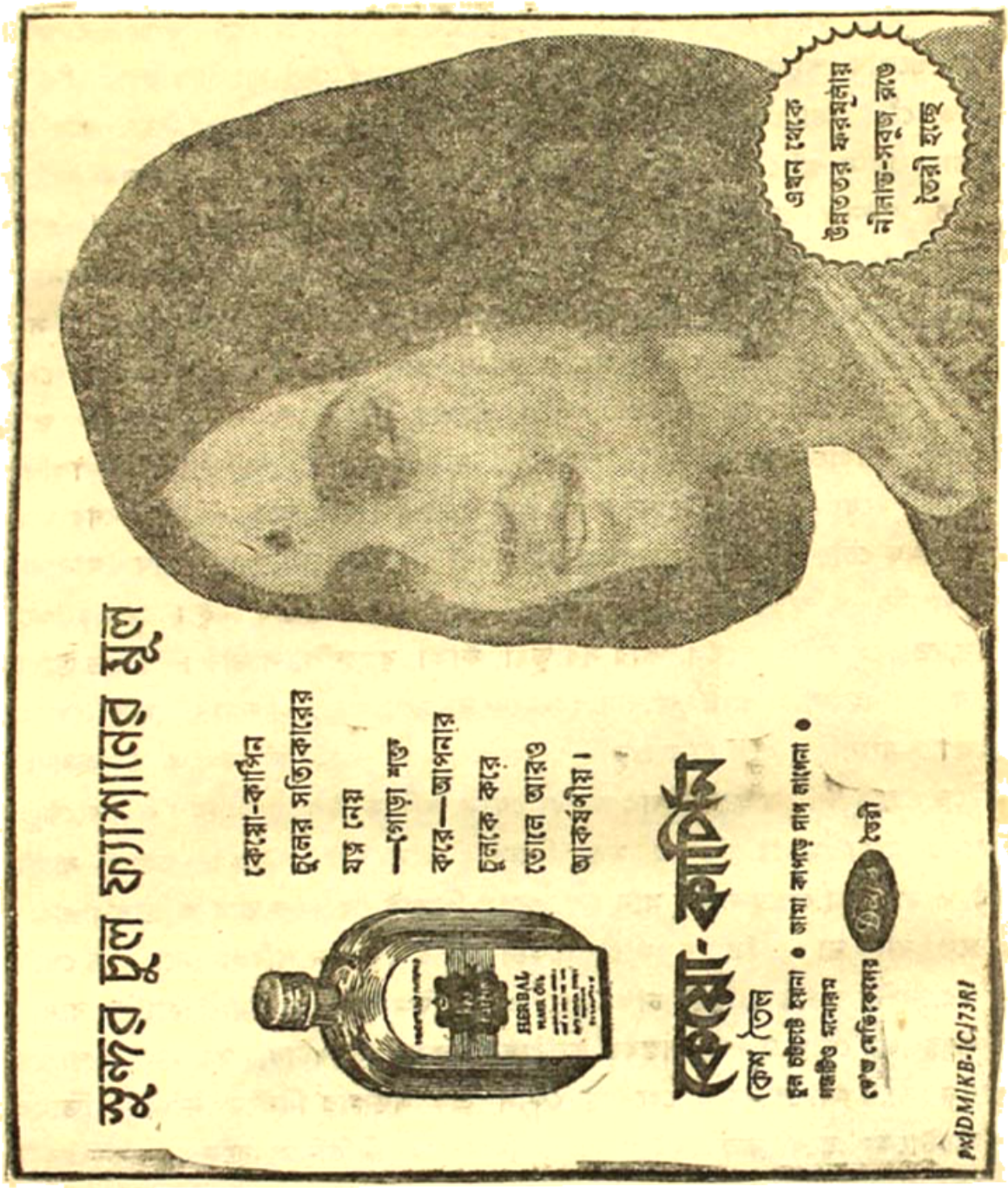

প্রকাশক : অমিয় রায়চৌধুরী, বাংলা ছোটগল্প, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত ও চ্যাটার্জী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

দাম : এক টাকা